একুশের গল্প

একুশের গল্প

একুশের গল্প

একুশের গল্প

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

রশীদ হায়দার

সম্পাদিত

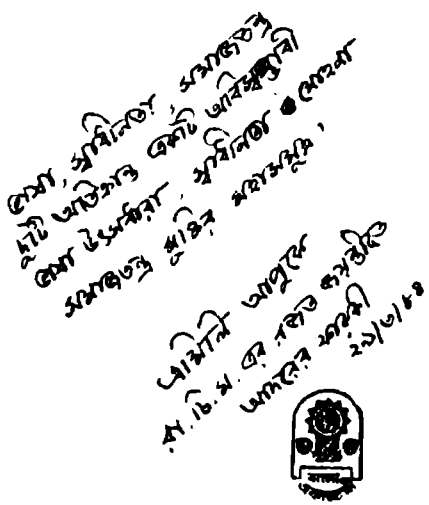

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৯০
ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

বা/এ ১৩৯৭
পাণ্ডুলিপি ঃ সংকলন উপবিভাগ

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

মুদ্রক
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস
ঢাকা

প্রচ্ছদ
কাজী হাসান হাবিব

মূল্য ঃ ২০·০০ টাকা মাত্র।

EKUSHER GALPO (Collection of short stories on 21st February) Published by Bangla Academy, Dhaka, Price: Tk. 20·00. US Dollar 2·00

সবিনয় নিবেদন

এই সংকলনের কাজে হাত দিয়ে লক্ষ্য করি, যে ভাষা-আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলন তথা যুদ্ধের প্রথম ভিত্তি, সেই আন্দোলন নিয়ে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিকরা তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম কাজ করেছেন।

লক্ষণীয়, আমাদের অনেক প্রতিষ্ঠিত কথা সাহিত্যিকের গল্প এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, চিঠিপত্রে যোগাযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে জানা গেছে, অনেকে একুশ নিয়ে কিছুই লেখেননি, অনেকে লিখলেও সূত্রের অভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

সংকলনের কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করতে হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, এসব গল্পের বাইরে আরো কিছু উল্লেখযোগ্য গল্প রয়েছে, যা অন্তর্ভুক্ত হলে, এ সংকলন আরো সমৃদ্ধ হতো।

কেবল একুশভিত্তিক গল্প নিয়ে এধরনের সংকলন এই প্রথম। তবে পূর্ণাঙ্গ নয়। আমরা আশা করবো, কেউ না কেউ এর পূর্ণতা দান করতে এগিয়ে আসবেন।

শুধু ইতিহাস নয়, সাহিত্যেও যদি 'একুশে'র যথার্থ প্রতিফলন না হয় তাহলে ওই-ইতিহাসই আমাদের ক্ষমা করবে না।

যাঁরা গল্প পুনঃপ্রকাশের অনুমতি ও নতুন গল্প দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

র. হা

সূচী

মৌন নয় ১
শওকত ওসমান

খরস্রোত ৮
সরদার জয়েনউদ্‌দীন

আমরা ফুল দিতে যাবো ১৪
মিরজা আবদুল হাই

হাসি ২৮
সাইয়িদ আতীকুল্লাহ

প্রথম বধ্যভূমি ৪৭
রাবেয়া খাতুন

অগ্নিবাক ৫৭
আতোয়ার রহমান

দৃষ্টি ৬৮
আনিসুজ্জামান

বরকত যখন জানত না সে শহীদ হবে ৭২
বশীর আল্‌হেলাল

ছেড়া তার ৮৮
মাহমুদুল হক

মীর আজিমের দুর্দিন ৯৩
সেলিনা হোসেন

উনিশ শ' তিয়াত্তরের একটি সকাল ১০৬
আহমদ বশীর

চেতনার চোখ ১১৯
আনিস চৌধুরী

বাংলাদেশ টোব্যাকো কোম্পানী লিমিটেডের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত

মৌন নয়

শওকত ওসমান

বাসে সমস্ত প্যাসেঞ্জার চুপচাপ বসে আছে।

কিছুক্ষণ আগে যেন অনেক কথা হয়ে গেছে। অনেক অনেক কথা। তারই তর্জ্জনী উঁচোনো উদ্ধত শাসনে সব চুপ। পার্শ্বস্থ ব্রত-চারী গাছপালা থেকে আগত নীড়-সন্ধানী পাখীদের মিষ্টি চীৎকার শুধু ব্যতিক্রম। অনেক, অনেক কথা ছড়ানো রয়েছে জীর্ণ বাসের কাঠের ফ্রেমে। এখন তাই সবাই স্তব্ধ। বিরহী কান্নায় বুক হাল্কা করে দিয়ে চেয়ে আছে বিষণ্ণ দিগন্তের দিকে। আর কথা বলা নিষ্প্রয়ো-জন। বাতাসের মর্মর শুধু কাজ করে যাক অন্ধকারে গড়ে-পড়া পাতার ধমনীতে। পৃথিবী আর্তনাদ শুনুক। মানুষের মুখ বন্ধ থাক।

অস্পষ্ট আলো জ্বলছে বাসের ভিতরে।

কণ্ডাকটার ফ্রেমের শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। প্যাসেঞ্জার ডাকা আজ তার কর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়; হাট-হাজারী বায়েজিদ বোস্তান নতুন-পাড়া তার মুখ থেকে খইয়ের মত ফুটে বেরোয় অন্যান্য দিন। আজ কণ্ডাকটারের ছুটি অথবা কোন প্যাসেঞ্জার প্রয়োজন নেই।

বাসের ঝাকুনির সঙ্গে সামাল দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে পা-দানীর উপর। তারও দৃষ্টি অন্ধকারের দিকে বাসের জানালা ছাড়িয়ে। ওপাশে আকাশের গায়ে সীতাকুণ্ড পাহাড়-শাখার স্তব্ধ টিলারা কুঁজো হয়ে দৌড়ের বাজি ধরেছে বাসের সঙ্গে। পাশে কালো নিস্তরঙ্গ মেঘের পটভূমি। যার বুক ফুঁড়ে কোন নিঃসঙ্গ খেজুর কি অন্য কোনো বুনো গাছ গোধূলি-হাওয়ায় দোল খাচ্ছে প্রবাহের সঙ্গ নিতে। কণ্ডাকটারের চোখে ঝাপসা আকার-আয়তন শুধু আঁকা হয়, তার কোন বস্তু-নাম থাকে না।

প্যাসেঞ্জার দশ-বারো জন। ড্রাইভারের পাশে একজন। তার মাথায় হ্যাট। কোন অফিসার হওয়া সম্ভব। ঐ মুখ দেখা যায় না। অন্ধকারে ড্রাইভারের সোজাসুজি গরাদের এপারে ঠিক মাঝখানে একজন বৃদ্ধ

উপবিষ্ট। বাসের আলোয় তার মুখ স্পষ্ট। সাদা দাড়ি-ঘন চওড়া রেখাঙ্কিত মুখ, খাড়া নাক। ঈষৎ কোটর-গত চোখের দু-পাশেও রেখার ভিড়। মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস গ্রহণের সময় বৃদ্ধ এক-একবার চোখ খুলছে, তখন কোটরের গভীরতা উবে যায়, দীপ্তির আভাস স্বতঃই প্রকাশ পায়, নামাজ-কালীন তহরীমা বাঁধার মত বুকে দুই হাত বেঁধে সে আছে। অবনত মুখ। দুই গণ্ডদেশের মাঝামাঝি নাক, আলো ছায়ার জাল বুনে রেখেছে। তাই এই মুখ মনে হয় আদিম পাহাড় চূড়ায় খোদাই কোন দরবেশের মূর্তি। গায়ে পিরহান ঝুলে পড়েছে পা-তক। কাঁধে লাল গামছা। পায়ে সাধারণ চটি। বসে আছে সে মৌন। নিঃশ্বাস নিতে তার ফোকলা গালে আরো খাদ সৃষ্টি হয়। আলো-ছায়ার অগোছালো বিকীরণ কোন কঙ্কাল-মুখ সৃষ্টি করে—যার গর্তে গ্রামের দুষ্ট ছেলেরা যেন সাদা শন গুঁজে দিয়েছে জীবন্ত মানুষ তৈরীর লোভে। সমস্ত প্যাসেঞ্জারের দৃষ্টি প্রায়ই এই বৃদ্ধের উপর নিবদ্ধ। অন্য সময় তারাও বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

বৃদ্ধের দুই পাশে দুইজন চাষী। সম্মুখে বাসের মেঝেয় এক জোড়া বাঁশের বজরা পড়ে আছে। কোন জিনিস নিয়ে শহরে বিক্রি করতে গিয়েছিল, এখন ফিরে যাচ্ছে হাটের শেষে। এই দুই জনের পরনে লুঙ্গি। ঈষৎ শীতের আমেজ আছে বাতাসে, তাই গায়ে গামছা লেপটানো। তারাও চুপচাপ। দুইজনে বৃদ্ধের দিকে ঘন-ঘন তাকায় তারপর মাথা নীচু করে কি যেন ভাবে। আবার জানালার বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

বাম পাশের চাষী একজন অনেকক্ষণ উসখুস করছিল। তার গলায় অস্বোয়াস্তি; পাকা বিড়ি-খোর সে। কিন্তু বিড়ি ধরাতে সাহস পায় না। কোন পবিত্র আস্তানায় যেন সে বসে আছে, সম্মুখে পীর-পয়গম্বর, এখানে বিড়ি ধরানো বেয়াদবী। এমন ধৃষ্টতা তার মনুষ্যত্বের বাইরে। দেয়াশলাই-বিড়ি বাম হাতে ধরে সে এমন জড় বনে গেছে, যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। বৃদ্ধের দিকে এক-একবার চায় আর মুখ নীচু করে সে।

ড্রাইভারের সোজাসুজি পাশবেঞ্চির উপর একজন তরুণ। হাতে বই দেখে নিঃসন্দেহে বলা যায় ছাত্র। গৌরবর্ণ মুখে কৈশোরের ছাপ একদম নিঃশেষে মুছে যায়নি। তার কৃশ লম্বাটে মুখাবয়ব পাষাণের মত স্থির। চুপচাপ সে-ও। হাটুর উপর হাটু তুলে অনড় হয়ে বসে

আছে। মাঝে মাঝে পায়ের অস্বোয়াস্তি কাটাতে যখন সে হাটু বদলায়, তার পায়জামার নীচে বাদামী জুতোর ঘষঘষ আওয়াজ হয়। কিন্তু এত মৃদু যে, স্টিয়ারিং আর ইঞ্জিনের তোড়ে তা থই পায় না। একটা বাংলা বই খুলে সে একঘেঁয়েমি ধ্বংসের চেষ্টা পেয়েছিল। কিন্তু চোখ আজ বইয়ের পাতায় শান্তি পায় না। সমতল, মাঠ, নতুন অফিস কি কারখানা ঘরের আলো ছাড়িয়ে টিলার ঘন-কালো অন্ধকারই বোধ হয় চোখের শ্রেষ্ঠ বিশ্রাম স্থল। কিসের ঝাপটা যেন ঐ তরুণের মুখেও ঝ্যাঁদা চালিয়ে এবড়ো-থেবড়ো অকর্ষিত-জমি-জাত রুক্ষতা লেপে দিয়েছে। দাঁতে দাঁত চেপে হাতের মুঠি শক্ত করে সে আজ মন-প্রবাহের উজানে গুন টানছে।

ছাত্রটির সোজাসুজি সম্মুখের বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট একজন কেরানী ভদ্রলোক। উত্তরমুখী বাসের যাত্রাপথ। সে পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে ঘাড় একটু কাৎ করে। কোন অস্বোয়াস্তি যেন নেই তার এমন আসনে। নিবিড় অন্ধকারেই বরং সোয়াস্তি জড়ো হয়েছে। উধাও-গতি বাসের সঙ্গে মনের সমতা রক্ষা অন্ধকার আঁকড়েই সম্ভব। একটু হাত-পাও নড়ে না তার। ভদ্রলোকের পাশে আরো কয়েকজন আছে। ছোট বাল্বের আলো ফিকে, সকলের মুখ দেখা যায় না। কিন্তু নিস্তব্ধতার ছোঁয়াচ তাদেরও রেহাই দেয়নি। ছাত্রের পাশে এমন আরো কয়েকজন। সবাই বোবা। কেউ কাশছে না পর্যন্ত। মফঃস্বলের উঁচু-নীচু পথে বাসের সফর সুখ-দায়ক নয়, গল্প-গুজবে এই অসুবিধা কিছু কমে। কিন্তু আজ কারো কোন উৎসাহ নেই। একজন জানালার পরাদে মাথা চেপে ধরেছে জোরে। হয়ত মাথা ধরা অথবা ক্ষোভে জ্বালায় হাত-পা ছোঁড়ার অশোভনতা থেকে মুক্তির উপায়স্বরূপ এই পন্থা।

একটা লেভেল ক্রসিং পার হতে বাসের গতি ঝিমিয়ে এলো। রেল লাইনের দু'পাশে খাদ. জোনাকি উড়ছে হাজার হাজার। খেজুর ঝোপ পাগলা বুড়ির মত বাতাসে উকুন খুঁজছে। ক্রসিং-এর পর একটু খাড়াই পথ। মোটরের ইঞ্জিন গীয়ার বদলের সাথে কঁকিয়ে উঠল। আবার পুরাতন স্পীড ঝেঁটিয়ে যাচ্ছে গাছ-পালার সারি, স্লান, ডিপা-জ্বলা অনিয়মস্তব্ধ চা-খানা, গেরস্থর ঘরবাড়ী, অন্ধকার-লুপ্ত ফসল

শেষ-নাড়া-বন। বর্ষাক্ষত পথের মধ্য স্থিত ছোট ফাটল পার হতে বাস বেশ ঝাকুনি খেয়ে উঠল। আরোহীরা জানালার রেলিং কি বেঞ্চ ধরে তাল সামলে নিল, কোন হৈ-চৈ করল না কেউ—অথচ আনন্দের এমনি সুযোগ মফস্বলে কে কবে অবহেলা করে? পথের ক্লান্তি হৈ-চৈ দিয়ে ঠাণ্ডা হয়. কে না জানে! আবার সমান পীচপথ। বাসের গতিসমান। একটু এগিয়ে যেতে এক পাশে ঝুলে পড়া মিঞ্জিরি গাছ বাসের গায়ে ডানা ঝটপট করে গেল। আজ কারো হুঁশ নেই। ড্রাইভারকে হুঁশিয়ারী ছাড়ছে না কেউ আগে থেকে। চোখে ডালপালা লাগতে পারে, এমন আশঙ্কাও নেই। হয়ত আজ কারো চোখ নিজের দিকে নেই। আর কোথাও—কোন রক্তাক্ত রাজপথে, কি কোন শোক-বিধুর গৃহ-প্রাঙ্গণে নির্বাকে থেমে আছে। সমস্ত বাংলাদেশের গাছ-পালা নদী-নালা খাল-বিল ছায়াপথ বন-জঙ্গল পার হয়ে, দূরত্বের ব্যবধান উপেক্ষা করে, বর্বরতার সম্মুখে স্তব্ধ মিছিলের লক্ষ চোখের দৃষ্টির সঙ্গে মিশে গেছে—আজ একক চোখে তাই মনে হয় দৃষ্টি নেই। তাই ত পুরাতন অভ্যাস ভুলে গেছে যাত্রীরা। ড্রাইভারের বাম হাতে একটা হলুদ-পাতা ডালের হোঁচট লাগল, সে আত্ম-রক্ষায় হাত বাড়াল না, থামল না—যেমন থামল না ঐ তরু শাখা। স্পীড আরো বেড়ে গেল। পাতায় আলিঙ্গন-বদ্ধ অন্ধকারের খিড়কী তুলে নক্ষত্ররা তাকায়। আবার বোবা মাঠের বিস্তার, উপরে খোলা আকাশ, তখন তারারা অনির্বাণ জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মত দেখায়। মৌন পূর্ববঙ্গ যেন ঐখানে জ্বলে জ্বলে জিজ্ঞাসা করছে: আমার শস্য-শ্যামলা হরিৎ প্রান্তর, তোমাদের এই অন্নাতুর কান্না কেন? তোমাদের ভাষা কোথায়? তোমরা স্তব্ধ কেন?

কেউ জবাব দেয় না। বাসের অভ্যন্তরে সবাই মূক। খটখট ইঞ্জিনের রব শুধু ফুঁসে উঠছে, তারও জবাব দেওয়ার কোন ভাষা জানা নেই।

লোকালয় পার হয়ে এল যন্ত্র-শকট, এবার দু'পাশে বে-বহা মাঠ। একদিকে পাহাড়ের শিরদাঁড়া থমথমে অন্ধকারে ঝাপসা। সমতল জমির উপর গাছ-পালার ছোপ আঁধারের বিচিত্র স্তরবিন্যাস সৃষ্টি করেছে। পাড় ভাঙা শুকনো দীঘি, ঝাউয়ের পাহারা-ঘেরা পল্লীপথের আত্মগোপনের ফাঁদ হেডলাইটের সম্মুখে ভেঙ্গে যায়। আবার একাকার

সব। টায়ারের নীচে মচ মচ শব্দ শুধু জানান্ দেয়, এখানে বসন্তের হাওয়ায় অনেক পাতা ঝরছে, পাতায় পুরু এই পথ। কাঠের ব্রীজে চাকা ওঠার সময় ঢোলের মত ডুগডুগ শব্দ হয়। এমন গতির মুখে ঝাউ মর্মর বন-কলতায় কোন দাগ কাটতে পারে না কানে। বাস চলছে চলছে। পৃথিবীতে এই এক মুহূর্তিক সত্য মাত্র জীবিত।

ছাত্রটির পাশে উপবিষ্ট কয়েকজনের মধ্যে একটি লোক বিড়ি বের করল। হাতে দেশালাই। অতি সন্তর্পিত—যেন তার কাজ কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। বিড়ি ধরাবে ভাবছে সে। একটা দেশালাইয়ের কাঠিও সে বের করল খোল থেকে। সম্মুখে বেঞ্চি থেকে একজন হাত ইশারায় বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর মাথা নাড়ে। বিড়ি ধরিয়ো না—তোমার লজ্জা করে না? এমনই ভাবখানা। নেশাখোরের আর নেশা করা হলো না। শার্টের পকেটে দেশালাই ঢুকল, দেশালাইয়ের কাঠি একাকী—ঢুকল। সন্তর্পণে ঐ ব্যক্তি আবার যাত্রীদের দিকে চেয়ে দেখে, কেউ তাকিয়ে নেই ত? শান্ত মুখে ভদ্রলোক অন্ধকারে নিজের দৃষ্টি ডুবিয়ে দিল। দুষ্কৃতি নিবারণকারী এতক্ষণ সহযাত্রীর দিকে তাকিয়ে ছিল। এখন তার চোখও জানালার বাইরে।

গোটা দুই বাঁক ফিরতে বাসের স্পীড সামান্য কমল। রাত্রির প্রহর শুধু কমে না। কমে না বাসের ভিতর স্তব্ধতার শাসন।

মাঠের সফর শেষ হয়ে গেল। আবার লোকালয় শুরু হয়েছে। দু'পাশে ঝিমমারা ঘরবাড়ী, দহলিজ, কলা বাঁশের বন। হেড-লাইটের আলো তীক্ষ্ণধার এই সড়কে। একদম শীত যায়নি। ফিকে কুয়াশা গাছপালায়। অন্যান্য দিন পার্শ্ববর্তী দোকানে কলরব ওঠে। আজ লোক বসে আছে, কিন্তু গলা-ফাটা চঞ্চলতা নেই।

এই লোকালয়ের পর ছোট মাঠ শেষে, বাসের একজন যাত্রী উসখুস করে কণ্ডাকটারের দিকে তাকায়। কিন্তু কোন কথা বলে না। হাবে-ভাবে মনে হয়, তার গন্তব্যস্থান নিকটে। কণ্ডাকটারের চোখে পড়ল একবার। সে একটু উঠে এলো ড্রাইভারের সোজাসুজি। তারপর পরাদের ভেতর হাত গলিয়ে চালকের হাতে একটু টিপ দিল। আর কোন কথা হয় না। বোবার রাজ্যে ঠোঁট থাকা বৃথা।

পল্লী-পথের মুখ বড় সড়কে এসে মিশেছে। দু-পাশে দুটো মোটা কদম গাছ। আঁকা-বাঁকা ধূলি-ধূসর পথের সর্পিলতা ওই দিকে অন্ধকারে উধাও। ঐ ভদ্রলোক ধীরে ধীরে নেমে গেল। বার বার তার চোখ ঐ মৌন বৃদ্ধের উপর নিবদ্ধ হয়। শেষবারের মত সে দেখে নিল বাসের দরজা থেকে। কণ্ডাকটার ভাড়া নিয়ে গলায় ঝোলানো ব্যাগে রেখে দিল। আলোর কাছে হাতের তালু চওড়া করে খুচরা পয়সা গোণা আজ নিষ্প্রয়োজন। প্যাসেঞ্জার ঠকিয়ে যেতে পারে? কিন্তু আরো বিরাট ক্ষতির দাগা খেয়েছে সে, তাই এই লোকসান তুচ্ছ। কণ্ডাকটারের স্বতঃই মনে হয়, আজ তাকে প্রতারিত করে যাওয়ার মত এত শঠ এই এলাকায় নেই।

আবার ধাবমান পথ, চাকা, গ্রাম-গ্রামান্তর।

বৃদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে একবার চোখ তুলে চাইল। কিন্তু চোখ তখনই বুঁজে যায়। বুঁদ হয়ে আছে সে চিন্তার কড়া ঝাঁঝে। কিন্তু তারপরই সমস্ত বাস-যাত্রীদের মধ্যে স্তব্ধতা বেড়ে গেলো। ছাত্রটি কি যেন বলতে গিয়ে থামল। বৃদ্ধের বদ্ধ মুঠি আরো শক্ত হয়ে উঠল। পার্শ্ববর্তী চাষী মাথা নাড়ল নিজের খেয়ালে—কোন আত্ম-কথোপকথনের বুদ্বুদের আঘাতে হয়ত। কেরানী ভদ্রলোকের মুখাবয়ব ঋজু কাঠিন্যে নিথর হয়ে এলো। অন্যান্য যাত্রীদের দৃষ্টি তখন বাসের অভ্যন্তরে। কণ্ডাকটার বাসের দরজায় দাঁড়িয়েছিল, সেও নিঃশব্দে উঠে এলো।

শুধু মোটর বাস নিজের চলা-পথে নির্বিকার। তার অন্ত-আলোড়ন খটখট রবে, দু-পাশের ফেলে আসা প্রকৃতির সমারোহে শব্দায়িত।

আবার মৌনতার প্লাবন।

পাড়া-গাঁ এখনও নিশুতি হয়ে যায়নি। পিদিম জ্বলছে উঠানে, ইটের পাঁজা তুলছে পাঁজারীরা খোলা মাঠে। কিন্তু এই সজীবতা বাস-যাত্রীদের ছুঁতে পারে না। এখানে মরার রাজ্য। কঙ্কালের মত সবাই বসে আছে। এত মানুষের নিঃশ্বাসও যেন মাথা তুলতে পারছে না নীরবতার বুকে। চাষীর হাত থেকে দেশালাই খসে পড়ল খড়খড় শব্দে। কিন্তু তা তুলতে গিয়ে নীরবতার পবিত্রতা-হানি, তার মনুষ্যত্ব বাধল, চাষীটার কণ্ঠনালীর উপরে একটু দোল লাগল। হয়ত চোয়াল আরো শক্ত করতে বা মুখের 'আব' ঘুচাতে।

আরো দু-মাইল পরে বাসের গন্তব্য স্থান। নির্বিকার যাত্রীদল বসে আছে। কারো কোন উদ্বেগ নেই, তাড়াহুড়া নেই বাড়ী ফেরার। বৃদ্ধের দুই হাত বুকে বাঁধা। সেও গন্তব্য-পথের হদিস জানে না। কিন্তু তার নিঃশ্বাস যেন দ্রুততর হচ্ছে। কয়েকজন যাত্রীর দৃষ্টি আবার বাইরে থেকে ঐ মুখের উপর পড়ে।

বৃদ্ধের নিঃশ্বাস আরো দ্রুত, আরো ঘন। যেন ডুবে যাচ্ছে সে। কুঁচকে ঢলে পড়ল, পা একটু সটান, প্রসারিত হোল তার।

হঠাৎ হাঁপ ছাড়তে গিয়ে বৃদ্ধের কণ্ঠনালী আর স্থির থাকে না। শক্ত কফ জমেছে যেন গলার দু'পাশে। ফোকলা গাল বার বার ওঠানামা করে। ঠোঁট কেঁপে উঠল। অসহ্য কি যেন বুক থেকে ঠেলে ঠেলে উপরে উঠছে।

চোখের দৃষ্টি অপলক, বৃদ্ধ এইবার ডুকরে আর্তনাদ করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে চুরমার হয়ে গেল নীরবতার জগদ্দল।

—"কি দোষ করেছিল আমার ছেলে? ওরা কেন তাকে গুলী করে মারল? কি দোষ—কি দোষ করেছিল সে? উঃ—"

কি দোষ করেছিল সে? এই জিজ্ঞাসা চিহ্ন ভাসছে তার চোখের উপর। এখন-ই মুখ থুবড়ে পড়বে বৃদ্ধ বাসের মেঝেয়।

সমস্ত যাত্রী তখন নিজের জায়গা ছেড়ে বৃদ্ধের উপর ঝুঁকে পড়েছে। চাষী দু'জন তার কোমর জড়িয়ে ধরল যেন পড়ে না যায়। ড্রাইভারের এক হাতে স্টিয়ারিং, অন্য হাত সে সবার আগেই বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

জোড়া-জোড়া জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি-স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ে। দমকে দমকে সিংহ-গর্জন এখনই ফেটে পড়বে। সকলের গলার রগ কেঁপে কেঁপে উঠছে দমকে-দমকে।

নির্বিকার গাড়ী শুধু এগোতে লাগল।

খরস্রোত

সরদার জয়েনউদ্‌দীন

কালো মোটা বোরাসাপের মত চীৎপাত হয়ে পড়ে আছে লম্বা একটা রাস্তা। তেমনি বোরা সাপের মতই রোদ আলোতে চিক চিক করে। ঠিক গো-ধুলির পরে সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া যখন ধীরে ধীরে নেমে আসে, তখন রাস্তাটার পূবের মাথায় দাঁড়িয়ে দেখলে পথের বৈদ্যুতিক আলোতে অমনি মনে হয়। রাস্তাটা রমনা খেলার মাঠের নিকট থেকে কার্জন সাহেবের ঐতিহ্যবাহী বাড়ীটার গেটে গিয়ে মাথাটা ঠুকেছে। রাস্তাটার একপাশে খেলার মাঠটা সামনে করে দুর্বল দেহে হামাগুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে। আছে কয়েকটি রেস্তোরাঁ তার পরই শুরু হয়েছে রেলের বস্তি। বস্তিটা লম্বা হয়ে এগিয়ে গিয়ে পশ্চিমে একেবারে রেল কারখানাটার সাথে যেন গা হেলান দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। এরই এক ঘরে বরকতের মা কাঁদে। রোজ কাঁদে। রাস্তাটার ওপারে সেক্রেটারিয়েট ভবনে আজাদীর পতাকা আনন্দের আমেজে পত পত করে ওড়ে, আর এপার থেকে বরকতের মায়ের কান্নার করুন সুর ডানা-ভাঙ্গা পাখীরমত আকাশে বাতাসে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে দিগন্তে ফেটে চৌচির হয়ে পড়তে থাকে। সারা দুনিয়ার মায়েদের হৃদয়ে বিষমাখা তীরের ফলার মত বিঁধতে থাকে। অসাড় নিস্পন্দ স্থবির হয়ে আসে মায়েদের হৃদয়। সে কান্নার সাথে কত কথা বরকতের মা বলেঃ ১৯৫২ সনের এক সকালে বরকত বলেছিল, মা, তোমাকে মা বলে যে ডাকবো তা নাকি আর পারবো না। ওরা আমাদের কত বড় শত্রু মা যে, মাকে মা বলে, বাবাকে বাবা বলে ওরা আর আমাদের ডাকতে দিতে চায় না। বলোত মা, আমরা কি তা মেনে নিতে পারি? আজ তারই জন্য শান্তি যুদ্ধ হবে মা, আমরা ধর্মঘট করবো। তুমি আশীর্বাদ করো মা, তোমার সেখানো বুলি যেন আমাদের মুখে অক্ষয় হয়ে থাকে।

"তাই হবে বাবা, যা তোরা জয়ী হবি।" মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আনন্দে বেরিয়ে গিয়েছিল বরকত কিন্তু আর ফিরে আসে নাই।

সে আজ থেকে ঠিক এক বছর আগের কথা। সেই থেকে বরকতের মা কাঁদে-রোজ অমনি করে কাঁদে। রাস্তাটার গা থেকে একটু লেজুড় বেরিয়ে বরকতদের বস্তির পাশ দিয়ে রেল কলোনীটাকে দু ফাঁক করে চিরে দিয়েছে। দূর থেকে দেখলে এ লেজুড়ের অস্তিত্ব বোঝা যায় না। মনে হয় ঘরগুলো হাত বাড়িয়ে পরস্পরের গলা জড়িয়ে পড়ে আছে। এ সাপলেজুড় রাস্তাটির ঠিক বাঁ পাশ ঘেঁষে প্রাসাদতুল্য বাড়ী। পামরোজ হাউস। তারই দোতলার দীর্ঘ বারান্দায় এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত পায়চারী করে ফিরছিলেন, খান বাহাদুর মীর্জা গোলাম হাফিজ, অবসর প্রাপ্ত এককালের বাঘা ডিস্ট্রিকট ম্যাজিস্ট্রেট। চুল পেকেছে, শুভ্র শুশ্রুতে মুখমণ্ডল আবৃত। পায়ে দামী নাগরা, পরণে চুড়িদার পায়জামা, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, হাতে একখানা লাঠি, চোখে আভিজাত্যের গরিমা। পায়চারী করছিলেন আর ভাবছিলেন, এ সংসারে আর অধিক দিন বেঁচে থাকার কোনও অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়না। সত্যই সংসারটা যেন দিনের দিন কেমন পিঁজরাপোল হয়ে উঠেছে। লঘুগুরু জ্ঞান, পাপপুণ্যের বিবেচনা, মান সম্মানের খাতির এ সব যেন সংসার থেকে উধাও হয়ে গেছে। গতকাল যাকে দেখেছি দারিদ্র্যের একটা চরম দৃষ্টান্ত হয়ে পথে পথে কুকুর বিড়ালের সঙ্গে আহার খুঁজতে আগামী পরশু হয়তো সেই তোমাকে মুখের উপর দু কথা শুনিয়ে যাবে তার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে। সুতরাং আর কেন? এ বেঁচে থাকার কোনও অর্থ হয় না। সংসারটা ছোট লোকের ঔদ্ধত্যে উৎপীড়িত হয়ে উঠেছে।

তাই খান বাহাদুরের বেঁচে থাকবার নেশায় ফাটল ধরেছে; জীবনের প্রতি জন্মেছে বিতৃষ্ণা।

যদিও মুখে বেঁচে না থাকার কথাই বলছিলেন, কিন্তু মনে ভেবে অস্থির হয়ে উঠছিলেন, কি করে দুদিন আরও সুখ সমৃদ্ধিতে পুত্র পরিজন নিয়ে বেশী বেঁচে থাকা যায়, কি করে এম, এ পাশ ছেলেটার সবাইকে টেককা দিয়ে একটা মস্ত চাকরী জুটিয়ে নিজে নিশ্চিন্ত আরামে গা ভাসিয়ে আভিজাত্যের গৌরবটাকে নিষ্কলুষভাবে রক্ষা করা যায়। ভাবছিলেন আর আতঙ্কে শিউরে উঠছিলেন, হয়তোবা তীরে এসে তরী ডুবে যায়, শেষ রক্ষা বুঝি আর হয় না? জীবনের পঞ্চাশটি বছর

লোহার খাঁচার মত করে পাজরার হাড় দিয়ে আবরে রেখেছেন যে আভিজাত্য, আর শেষ রক্ষা নিয়ে খান বাহাদুর বড় উতলা হয়ে উঠেছেন। ছেলেটা হল কি? আরে এম, এ, পাশ করেছিস, সিভিলিয়ানের ঘরে জন্ম, কোথায় বাঘের বাচ্চা বাঘ হবে, না রাত দিন চাষাভুষো, মুচি মেথর যতসব ছোট লোকের জাত নিয়ে ঘাটাঘাটি। ছো, ছো ইজ্জতটা একেবারে নোংরা করে ছাড়লো, বংশ মর্যাদার মুখে কালি লেপে দিল দেখছি। খান বাহাদুর হন হন করে ভিতর বাড়ী গিয়ে ফেটে পড়েন, "বলি মেম সাহেব। আপনার গুণধর পুত্র আজ কোন্ চুলোয় গিয়েছেন? কোন্ মেথর পল্লির লোক আজ হুজুরের নিকট ফরিয়াদ নিয়ে এসেছিলেন যে রোগ-শোকে আমাদের ঔষধ পথ্য নাই। যদি জানা থাকে আমায় একবার দয়া করে বলুন, না হয় সেখান থেকেই তাকে আমি তুলে নিয়ে আসবো।"

খান বাহাদুরের ক্রোধের কোন কারণ ঘটলেই তিনি স্ত্রীর সহিত অমনি কেমন যেন ব্যঙ্গের স্বরে কথা বলতে থাকেন। এটাও নাকি তার আভিজাত্যের একটা অঙ্গ। মধ্যবিত্ত ঘরে জন্ম মরিয়ম বেগম জীবনে সুখ যত ভোগ করেছেন, লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করেছেন তার চাইতে অনেক বেশী। আভিজাত্যের সুচাগ্র সূক্ষ্ম কাটায় চিরেচিরে মনটা তার ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে, তবুও মুখ বন্ধ করে জীবনটাকে হেচড়ে টেনে শেষের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলছেন। খান বাহাদুরের কোন কথায় কোন প্রতিবাদ তিনি কখনও করেন নাই, আজও করলেন না, চুপ করেই রইলেন। এ যেন সর্বংসহা ধরিত্রী। রোদ বৃষ্টি, তাপ তিতায় কোন ভ্রুক্ষেপ নাই। খান বাহাদুর চিরদিনের অভ্যাস মত আজও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেনঃ আত্মমর্যাদা, মান সম্মান, প্রতিপত্তি এ সব প্রতিষ্ঠা করা মুখের কথাটি নয়। তুমি সে সব নষ্ট করে দিলে। ছেলেটা একেবারে ভবঘুরে লক্ষীছাড়া হয়ে গেল। এই তো আজকে ইণ্ডাস্ট্রি মিনিস্টারের সঙ্গে একটা এনগেজ-মেন্ট করেছিলাম বেলা সাড়ে এগারটায়। মুনিরকে নিয়ে গেলে টি বোর্ডের একটা জাঁদরেল অফিসারের চান্স দেবেন বলেছিলেন। সাড়ে এগারটা বাজতে আর মাত্র ১০ মিনিট বাকী, অথচ আপনার বাহাদুর পুত্রের কোন খোঁজ নাই। জীবনের চান্স এ রকম অবহেলায়

হারালে তা আর ফিরে আসেনা। আমি সিভিলিয়ান হয়েছিলাম কম সাধ্য সাধনায় নয়, জীবনের কোন চান্সকে একটু পাশিয়ে যেতে দেই নাই। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, একটু বাগ সামলে চল, ছেলেটা যে দিনে দিনে একেবারে বখে যেতে বসেছে।

উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে বাকশূন্য চোখে চেয়ে থাকেন মরিয়ম বেগম। তখনও ভেসে আসছিল বরকতের মায়ের কান্নার সুর, সে বেদনায় মরিয়ম বেগমের হৃদয় সাগর উদ্বেলিত হয়ে উঠছিল। তিনি ভাবছিলেন এ পোড়া দেশের মায়েদের হৃদয় সাগর ভরে এ আগ্নেয়গিরির জ্বলন আর কতকাল জ্বলবে।

খান বাহাদুর যেমনভাবে এসেছিলেন তেমনভাবেই আবার ফিরে গেলেন। মরিয়ম বেগম বসে বসে কত কথাই ভাবছিলেন, আল্লা তুমি ছেলেদের জয়ী করে দাও, সত্যের জয় হোক! আর সে সত্যের মধ্য দিয়ে চির অক্ষয় হয়ে বেঁচে থাক বরকতের মায়ের স্নেহের বরকত।

এমন সময় ফরিদা এসে পিছন থেকে ডাক দিল, "জান মা, আজ আমাদের প্রভাত ফেরী ছেলেদের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। তবে দাদু ভাইদের দলে ছেলে ছিল অনেক বেশী। আমরাও কিন্তু কম যাইনি মা, কয়েকটা স্কোয়াড মিলে প্রায় হাজার মেয়ে হবে।" মায়ের মুখে সদ্য ফোটা ফুলের মত হাসি ফুটে ওঠে। ফরিদার গায়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে মা বলতে থাকেন, সেই কোন ভোরে গেছিস, চা পানি কিছু খেয়েছিস, না উপোষ দিয়ে রয়েছিস। ফরিদা হাসতে হাসতে জবাব দেয়ঃ "জান মা আমার চাইতে অনেক ছোট ছোট মেয়ে কিছু না খেয়ে ছিল।"

মা ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করেন, "আচ্ছা হ্যারে, তোর দাদুভাই কোথায়, সে কখন আসবে?"

ফরিদা বলেঃ "বাপরে, দাদু ভাইয়ের কথা ছেড়ে দাও মা, তার কি অবসর আছে? অনেক কাজ করতে হবে আজকে, আগামীকাল একুশে ফেব্রুয়ারী, কত প্রোগ্রাম করা হয়েছে।"

মায়ের হৃদয় সাগর স্বর্গীয় আনন্দে আপ্লুত হয়ে আসতে থাকে। তিনি নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন ফরিদার দিকে। তার সারা হৃদয়ের স্নেহ যেন চোখ দিয়ে উপচে ওঠে স্নান করিয়ে দেয় ফরিদাকে। তিনি

আরও কত কথা শুনতে চান ফরিদার নিকটে। কোন পথ দিয়ে মিছিল যাবে, সব ছেলে মেয়ে মিলে মিছিলে কত লোক হবে, কি তাদের দাবী হবে, আমাদের এ পথ দিয়ে মিছিলে যাবে তো? কিন্তু একটি কথাও মুখফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারেন না, কণ্ঠটা কেমন যেন আবেগে শিথিল হয়ে যায়। এমন সময়ে বাইরের ঘরে খান বাহাদুরের গম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ শোনা যায় "মুনীর, তোমায় আমি আজ কোথাও যেতে নিষেধ করেছিলাম। কোথায় গিয়েছিলে তুমি?" স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর অথচ বিনীত কণ্ঠে জবাব দেয় মুনির "উপায় ছিলনা বাবা। দেশের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে যখন দেশেরই দাবী নিয়ে এগিয়ে চলেছে, তখন আমি নির্বাক হয়ে বাড়ীতে বসে থাকতে পারিনে বাবা, দেশের প্রতি আমারও কর্তব্য আছে। তাই সবার সঙ্গে প্রভাত ফেরিতে বেরিয়েছিলাম।" বলেই মিনতি ভরা করুণ চোখে তাকাল মুনির। 'প্রভাত ফেরী' গম্ভীর গর্জনে সিংহের মত হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন খান বাহাদুর। তারপরেই হঠাৎ কেন যেন তার বাকরোধ হয়ে গেল, কোন কথা আর তিনি উচ্চারণ করলেন না। মুখ চোখ তাঁর গম্ভীর বিষাদে ছেয়ে গেল, মৌন পাহাড়ের মত গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে নিজের কক্ষে ফিরে গেলেন। মা এসে তার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ঢেলে দিয়ে ডাকলেন, 'মুনীর আয় বাবা ভিতরে আয়।' এর কিছুক্ষণ পরেই এক দল পুলিশ এসে মুনীরকে বন্দি করে নিয়ে চলে গেল। খান বাহাদুরকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছিল পুলিশের লোক, হাঁ, না, একটি কথাও বলেন নাই খান বাহাদুর সাহেব।

তারপর থেকে সারাটা দিন তার কামরায় গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন খান বাহাদুর, মা কয়েকবার দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এসেছেন, সাহস করে কোনও কথা পর্যন্ত বলেন নাই। পরিচারিকা গিয়ে খাবার দিয়ে এসেছে, না খাবার মত কিছু খেয়েছেন, আর সবই অমনি পড়ে আছে। সেই একইভাবে বসে বসে রাজ্যের কি যে সব ভেবে চলেছেন তিনি, তার যেন কোন কূল কিনারা নেই। সারাটা রাত্রি তার অমনি বসে বসে ভাবতে ভাবতে কেটে গেছে। তারপর চির অভ্যাস মত ভোরে উঠে দোতলার বারান্দায় পায়চারী করে ফিরছেন, আসমান জমিন কত কি যে সব ভেবেই চলছেন, বাড়ীর সামনে দিয়ে

মেয়েদের প্রভাত ফেরী করুণ গান গাইতে গাইতে চলে গেল, দূর মসজিদের মিনার থেকে আজান ধ্বনি ভেসে এলো, ভেসে এলো বরকতের মায়ের কান্নার করুণ সুর। তবুও একভাবে পায়চারী করে ফিরছেন খানবাহাদুর, কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। ক্রমে পূর্ব আকাশ অরুণোদয়ের আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, ইউনিভারসিটির দিক থেকে হাজার কণ্ঠের বজ্রগম্ভীর আওয়াজ ভেসে আসছে, "শহীদ সেনারা অমর হোক"। মিছিল ক্রমেই এগিয়ে আসছে, আওয়াজ ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছে। লাখ জনতার মিছিল ক্রমে ক্রমে পামরোজ হাউসের গেটে এসে থেমে গেল। তারপর চিৎকার করে অনেক ডাকলোঃ মুনীর, তোমার যে শহীদ বেদীতে পুষ্পমাল্য দিতে হবে, শীঘ্র এসো ভাই।

থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন খান বাহাদুর, তারপর ধীরে ধীরে নেমে এলেন মিছিলের সামনে। অশ্রুভরা চোখে বেদনার্ত কণ্ঠে জানালেন তিনি, "মুনীরকে যে কাল পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, আমি গেলে চলবে বাবা সকল।"

মিছিল আবার এগিয়ে চললো।

আমরা ফুল দিতে যাবো

মিরজা আবদুল হাই

কল্পনার ঘুড়িটাকে আকাশের শূন্যতায় উড়িয়ে লাটাইর সমস্ত সূতা ছেড়ে দিয়েও কেউ আঁচ করতে পারবে না যে, আমার জীবনেও অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটতে পারে।

আমি একজন অত্যন্ত ছা পোষা গোছের লোক। এক অফিসে কনিষ্ঠ কেরানীর কাজ করি পাঁচ ছ'বছর যাবৎ। আমার কাজে বিদ্যা-বুদ্ধির দরকার হয় না। চিঠিপত্রের নাম নম্বর-খাতায় উঠাই। যে চিঠি বাইরে যাবে তাতে নম্বর ফেলে, খামে ঢুকিয়ে আঠা লাগিয়ে তার উপর ঠিকানা লিখি। পিওন-বইতে চড়িয়ে অফিসেরই আরেক বিভাগে পাঠিয়ে দিয়েই খালাস। এর জন্য আমার বি, এ, ফেল করা বিদ্যার প্রয়োজন হয় না। ক্লাস নাইন পর্যন্ত যে বিদ্যা হয়েছিল তাতেই সারা যেত। ঘন্টা দু'য়েক মন লাগালেই দিনের কাজ শেষ। গল্পসল্প করতে আমি যুৎ পাই না। মাঝে মাঝে বাংলাদেশ পরিষদে গিয়ে পত্র-পত্রিকার পাতা উল্টাই। কোনদিন আগের বই ফেরত দিয়ে নতুন বই নিয়ে আসি। এইটুকুই আমার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। বাবা নাকি খুব বই পড়তেন। বাঁধানো খাতায় কবিতা লিখতেন। অবশ্য তার কোন কবিতার বই ছাপাটাপা হয়ে বেরোয়নি। এসব আমার চাচা ও শ্বশুরের মুখে শোনা। চাচা আর শ্বশুর একই ব্যক্তি। চাচার মেয়ে লতিফা এক যুগ ধরে মুরাদ ভাই, মুরাদ ভাই বলে ডেকে এখন কিছুই ডাকে না। এ্যাই শুনছ ইত্যাদিতে কাজ চালিয়ে দেয়। পাশের বাড়ীর বৌ-ঝি আত্মীয়-স্বজনদের কাছে কবির বাপ বলে পরিচয় দেয়। একমাত্র মেয়ের নাম রেখেছিলাম কবিতা। এ নামটা লতিফার খুব পছন্দ ছিল না এবং সেই কারণেই বোধহয় অবচেতন মনের ক্রিয়ার নামের শেষ দিকের স্ত্রীধর্মী 'তা' খসে পড়ে পুরুষ নারী উভয়ার্থক কবিতে সংক্ষিপ্ত হয়েছে। ছ' বছর ধরে কবি বলে ডাকতে ডাকতে, এতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এর ব্যাকরণ বা ভাবার্থ নিয়ে মাথা ঘামাই না।

আসলে আমি কোন কিছু নিয়েই মাথা ঘামাই না। নিজের নামে বাসার বরাদ্দ না পেয়ে এক সহকর্মীর দয়ায়ই বলতে হবে তার আগার গাওয়ের সরকারী কোয়ার্টারের ফ্ল্যাটের এক কামরা দেড়শ টাকায় ভাড়া নিয়ে থাকি। রান্না আর গোসল দু'পরিবারের এজমালী। সরকারী বাসে অফিসে যাওয়া-আসা করি। একমাস অন্ধকার থাকতে ঘুম থেকে উঠে, পান্তাভাত বা আটার রুটি গুড় দিয়ে খেয়ে ছ'টায় বাস ধরি। এই একমাস ঠিক দুটায়ই ফেরার বাস পাওয়া যায়। প্রায় আড়াইটায় বাসায় পৌছে যাই। এর পরের মাস সাতটায় রওয়ানা দেই, সাড়ে তিনটার পর বাসায় ফিরি। এক একটা বাস দু'তিনটা করে খেপ দেয় বলে এই ব্যবস্থা। তাও ভালো। সার্ভিস বাসে উঠার মল্লযুদ্ধ থেকে ত মুক্তি পাওয়া গেছে। ঘরের কাছেই পাঠশালা। সেখানে মেয়েকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছি। আমার কোন দুর্ভাবনা নেই।

যা বেতন পাই তা এ মাগগী গণ্ডার বাজারে কুলায় না। তা কুলাক আর না-ই কুলাক চলতে তো হবেই। তবু শ্বশুর সাহেব আমার বাবার মৃত্যুর কারণে যে সামান্য টাকা পেয়েছিলেন তা দিয়ে আমার নামে কিছু জমি কিনে রেখেছিলেন। তাই, ভাগীতে করিয়ে, ধান বিক্রির টাকাটা পৌছে দেন। এতে চলে যায় মন্দনা। আর তাই বোধহয় আমার কোন উচ্চাশা নেই। হায় হায়, নাই নাইর হতাশা আমাকে ধরতে পারে না। কুয়েত আবুধাবী, আরবের সত্যিকারের মরুদ্যানকে আমার কাছে মরীচিকাই মনে হয়।

আমার জীবনে কোন ঘটনা ঘটে না। যেমন একটা রিকশা একসিডেন্ট, প্রাইজবণ্ডের লিস্টে আমার নম্বর ওঠা কিম্বা হঠাৎ বড় সাহেব ডেকে নিয়ে বললেন, তুমি একটা ওয়ার্থলেস, তোমাকে চাটগা বদলি করা হল অথবা অফিসে গিয়ে দেখলাম আমার পদবী কনিষ্ঠ থেকে জ্যেষ্ঠে উন্নীত হয়েছে। আসলে আমার কাজ বড় সাহেব কেন ছোট সাহেবরও নজরে যাবার নয়। ঢাকা ছাড়া আমাদের আরকোনখানে কোন অফিসও নেই। আর কনিষ্ঠতার মান বাড়তে এখনও অনেক বছর বাকী। আমার মাথার উপর যারা আছেন—তাদের মাথার উপর শুধু ছাদ। ভেন্টিলেটার যাও একটা মাত্র আছে তারও ফোকড় বড় ছোট।

এমনকি প্রেম-ট্রেম ঘটিতও জীবনে কিছু ঘটেনি। শেরেবাংলা নগরের তথা কথিত দ্বিতীয় রাজধানীর অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি আর অতিমাত্রায় শহুরে লেকের ধারে কিম্বা বিমান বন্দরের পাশ দিয়ে যে অর্ধ সমাপ্ত চওড়া সড়ক গেছে তা দিয়ে বিকেলে যখন মাঝে মাঝে বেড়াই, তখন কোন দিন কোন বনলতা সেন জাতীয় কেউ পাখীর নীড়ের মত চোখ তুলে কেন অতি সাধারণ ডাবড্যাবে চোখ তুলেও কোন আটপৌরে ফাতেমা জুলেখা নাম্নী মেয়ে বা স্ত্রীলোক জিজ্ঞেস করেনি—এতদিন কোথায় ছিলেন? আমাকে ওরকম কেউ চিনেই না যে লেকের ধারে বা রাস্তায় কোন প্রশ্ন করবে। দু'তিন জন মহিলা অবশ্য আমাদের সংগে বাসে যাওয়া আসা করেন—কিন্তু তারা কোন্ অফিসে চাকুরি করেন তাও জানি না। তাদের স্বামী আছেন না কুমারী এও জানা নেই। আমি যেমন তাদের লক্ষ্য করি না তারাও আমাকে কোনদিন লক্ষ্য করেছেন বলে মনে হয় না।

প্রেম, ভালবাসা হওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল কবির মায়ের সংগে। মানে আমার চাচাতো বোনের সংগে, তাদের বাড়ীতেই আমি মানুষ। তাদের বাড়ী যা আমাদের বাড়ীও তাই। একই বাড়ী তবে বাবা থাকতে নাকি একান্নবর্তী ছিলাম না। বাবা বাড়ীতে কদাচিৎ আসতেন ছুটি-ছাটায়। ছোট বেলায় বাবা মারা যান হঠাৎ। অফিসে কাজ করছিলেন —এক সময় টেবিলে মাথা রেখেই শেষ। ছাত্র অবস্থায় বাবার বেরীবেরী হয়ে হার্ট দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হার্ট দুর্বল হলেও তার সাহস ছিল অপরিসীম। বড় হলে সবই চাচার মুখে শুনা। বাবা খুব বিদ্বান আর বড় চাকুরে ছিলেন। এ রকম বিদ্বান আর বড় অফিসার আমাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে এখন পর্যন্ত কেউ হতে পারেননি। বাবা তখনকার ই. পি. সি. এস পরীক্ষা পাস করে ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। তার মত সৎ আর নির্ভীক অফিসার নাকি খুব কমই পাওয়া যেত। বাবা মারা যাওয়ার সপ্তাহ খানেকের মধ্যে মাও বাবার সংগ ধরেন। তাদের লাশ আর বাড়ীতে আনা হয়নি। কোথায় উত্তরবংগের এক থানা সদরের গোরস্থানে তাদের দাফন করা হয়েছিল। এত দূরে তাদের কবর দেখতে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কবরের কোন চিহ্ন আছে কিনা তাও জানা নেই। বাবার নাকি খুব সখ ছিল আমাকে খুব

ভাল স্কুল কলেজে পড়িয়ে দেশের সবচেয়ে বড় চাকুরীর জন্য তৈরী করবেন।

এর পর থেকে চাচার কাছেই মানুষ। লতিফা ছোটবেলা থেকেই আমার খুব ন্যাওটা ছিল। দুজনে একসংগে খেলতাম। ঠিক একই খেলা নয়। আমি ডাং গুটি, বাতাবী লেবুর ফুটবল খেলতাম, ও বউ-বউ খেলত। আমার জন্য ঘাটির হাড়ি ভাংগা বাসনে বালুর ভাত আর ঘাসের তরকারি করে খাওয়ানোর জন্য অপেক্ষা করত। ওর নাকে নোলক ছিল আর নোলকে নাকের সর্দি লেগে থাকত। আমার তখন খুব ঘেন্না করত। একদিন ধমক দিয়ে বলেছিলাম তোর নোলকটা টেনে ছিড়ে ফেলেই দিতাম কিন্তু হাত দিতে ঘেন্না করে।

ও খুব কেঁদেছিল সেদিন। আধাদিন কথা বলেনি আমার সংগে। শেষে নিজেই বরুইয়ের চাটনী বানিয়ে আমাকে খাইয়ে আড়ি ভাংগায়। দোষটা যেন তারই। ও যখন বেশ বড়-সড় তখন আমি কলেজে পড়ি। পাঁচ ছ'মাইল পথ কাদাপানি ভেংগে, খড়ের চাল আর বেড়া ভাংগা কলেজে যাওয়া আসা করি। তখন ওর সংগে একটু আধটু প্রেম-সেম করা যেত কিন্তু আমার ওসব খেয়ালে আসেনি। ওর সংগে বিয়ে না হলে, হরিপদ কেরানীর মত, ঢাকাই শাড়ী পরা, কপালে সিঁদুর না হোক, সুরমা লাগানো চোখ আর মাথায় অর্ধেক ঘোমটা দেওয়া চাচার মেয়ের জন্য আক্ষেপ করতে পারতাম। তাও হল না।

আমার জীবনে কোন উৎসবও নেই। দুই ঈদে লতিফার জন্য কোনবার ঢাকাই বিটি বা সস্তা নাইলনের প্রিন্টেড শাড়ী। কবির জন্য ফ্রক, প্যান্ট দরকার হলে জুতা এক জোড়া নতুন কিনে দেই। লতিফা ঘরে সেমাই বানায়। একটা মুরগী জবাই করে রেশনের সয়াবিন তেল দিয়ে পোলাও-কোর্মা করে। আমি ধোয়া পাজামা, পাঞ্জাবী আর নাইলনের সুতার কাজ করা কিস্তি টুপী মাথায় দিয়ে স্থানীয় মসজিদে ইমামের পেছনে ছয় তকবীরের সাথে দুই রাকাত নামাজ পড়ি। মোনাজাত শুরু হলে ইমাম সাহেব সারা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য শুভ কামনা করেন—মধ্যপ্রাচ্যে থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত। নিজের জন্য আমার কোন প্রার্থনা নেই। মাঝে মাঝে খোলা মাঠে এড়ে বাছুরের মত উদ্দেশ্যবিহীন ছুটে চলা মনটাকে আগলে পাছলে এনে সবার সংগে

'আমিন আমিন করি। আমার ব্যক্তিগতভাবে চাওয়ার কিছু নেই। ঈদের নামাজে চাওয়ার নাকি রেওয়াজও নেই। নামাজ শেষ হলে দু'এক জনের সংগে যন্ত্রের মত কোলাকুলি করে, দু'এক বাসার সেমাই একটু একটু চেখে বাসায় ফিরি।

এহেন আমারও আবার দু'একটা সাধ আহলাদ আছে। অবশ্য একে সাধ আহলাদ বলা যায় কি না জানি না। যেমন বউ আর মেয়েকে নিয়ে বাসে করে লটকে-ঝটকে বাংলা একাডেমীর পয়লা বৈশাখ মেলায় যাই। মেয়েকে দু'একটা মাটির পুতুল খেলনা কিনে দেই। লতিফা দু'একটা কুলা-ডালা কেনে। ওদের বাদাম কিনে দেই। চাট খাওয়াই। আমি এক কাপ চা খাই। ওদের আবার এ পানীয় দ্রব্যের প্রতি কোন লোভ নেই।

এছাড়া একুশে ফেব্রুয়ারীতে আমি একা ভোর পাঁচটার সময় চিত্র-শিল্পীদের মত কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে বাস ধারে আজিমপুর গোরস্থানে যাই। যাওয়ার সময় আমাদের বাগান থেকে কয়েকটা গাদা, নয়নতারা আর জবাফুল নিয়ে যাই, বাগান মানে দু'হাত প্রস্থ আর আটহাত দীর্ঘ আলাদা করে বেড়া দেওয়া ঘরের সংগে এক চিলতে জায়গা। এ বেড়াটা আমার নিজস্ব। বাকী জায়গাটা আমার বাড়ীওয়ালা সহকর্মীর যিনি বেআইনীভাবে আমাকে কামরাটা সাবলেট দিয়েছেন। সেখানে তিনি বেগুন, ডাটা, লাল শাক, সীম, লাউ ইত্যাদি তরিতরকারি লাগান। নীচের তলায় থাকার এই সুবিধা।

গোরস্থানে পৌঁছার আগেই স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল জোড়া ঝোলায় ভরে নেই। ওখানে গেলেই বিষণ্ণতা আমাকে জাবড়ে ধরে। শহীদদের কবরে দু'একটা করে ফুল দেই। জেয়ারত করি। দোয়া-দরূদ আমার জানা নেই। আমাকে কেউ শেখায়নি, শুধু আলহামাদু সুরা পড়েই কাজ চালাই। তারপর খালি পায়ে সবার সঙ্গে হাঁটি। আমি কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলোর দিকে চেয়ে পথ চলি। ফেব্রুয়ারীর প্রায় কবিতায় কৃষ্ণচূড়া ফুটে থাকার কথা পড়ি বলেই গাছের মাথায় আমি লাল ঝালরের সন্ধান করি—যদিও আমি জানি এসময় কৃষ্ণচূড়া ফোটে না। এ সময় আসে আরও পরে। শহীদ মিনারে পৌঁছে আমার বাকী ফুলগুলো দিতে গিয়ে দেখি বেদীর উপর সব ফুলই যেন রক্তমাখা কৃষ্ণচূড়া হয়ে গেছে। আমার

গাদা নয়নতারাও লাল। আবার হাঁটতে হাঁটতে আমি বুঝতে পারি কৃষ্ণ-চূড়া আর মানুষের রক্তের সঙ্গে রং-এর কিছুটা সাদৃশ্য আছে বলেই আমার এ দৃষ্টি ভ্রম। প্রথমে বাংলা একাডেমীতে এসে একটু জিরিয়ে নেই। তারপর যাই রমনার বটমূলে। সেখান থেকে আবার একাডেমী। এখানে পাওয়া গেলে এক কাপ চায়ের সঙ্গে সস্তা দামে দু'একটা বিস্কুট বা ডালপুরী খাই। কবিতা গান ইত্যাদি শুনি। ছেলেদের পাল্লায় পড়ে দু'একটা সংকলনও কিনে ফেলি। বইর দোকানে ভিড় ঠেলে বইর নাম পড়ি। অনেক লোকের মধ্যে আমি হারিয়ে যাই। কচিৎ পরিচিত কারো সংগে দেখা হয়। কারণ আমার সংগে যাদের পরিচয় তারা এখানে বড় একটা আসেনা। এখানে ঘুরাঘুরি করা অবস্থায় আমার খুব কবিতা লিখতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কবিতাত আমি লিখতে পারি না। এ অনুভূতিটা বোধ হয় আমার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। বাবা কবিতা লিখতে পারতেন, আমি পারিনা। এর অর্থ বোধ হয় উত্তরাধিকারের ধারাটা আমার মাঝে ফিকে হয়ে এসেছে। ফেব্রুয়ারীতে বাসায় ফিরতে ফিরতে প্রায় দেড়টা-দুটা বেজে যায়। সেদিন বোধ হয় হাটতে হাটতে আর পর্যাপ্ত প্রাতঃরাশের অভাবে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ি। সারাদিনটাই আমি খুব বিষণ্ণ থাকি। এমনিতেই বোধহয় আমার রক্ত প্রবাহে বিষণ্ণতা সৃষ্টিকারী কোন রাসায়নিক ভেজাল আছে।

লতিফারও দু'একটা সখ আছে। যেমন ছ'মাসে-ন'মাসে সিনেমা দেখতে চায়। বাসার প্রায় কাছাকাছিই একটা সিনেমা হল আছে। হেটেই যাওয়া যায়। কিন্তু যাও বা বছরে একবার কি দু'বার তার সখ হয় তবু প্রায়ই প্রেক্ষাগৃহপূর্ণ রক্তাভ সাইন বোর্ডের দাঁত খিচুনী দেখে আমাদের বাদাম বা ছোলা ভাজা চিবুতে চিবুতে বাসায় ফিরে আসতে হয়। আমরা অবশ্য সিনেমার উপরের তলায় পা বাড়াইনা। অথচ নীচের তলার টিকিটই কালোবাজারে আমাদের ক্ষমতা ডিংগিয়ে যায়।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ করি বলে দ্বিতীয় সন্তান হওয়ার মত ঘটনাও ঘটে না। এত সব কথার সারাংশ হল আমি নিরুপদ্রব। নিরুত্তাপ নিস্পৃহ একটা জীবন যাপন করি কিন্তু তার জন্য আমার নিজের বা আমার স্ত্রীর কোন আক্ষেপ নেই। আক্ষেপ হতে পারত যদি আমরা এসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতাম কিন্তু আমাদের ও বালাই নেই। ছোটবেলায় বাবা

মা মারা যাওয়ায়ই বোধ হয় এমনটি হয়েছে। আমরা যেন সংসারে বাস করেও বানপ্রস্থে আছি।

গেল বছর একুশে ফেব্রুয়ারী গোরস্থান থেকে জনস্রোতের ধারায়, বিষণ্ণতায় ভাসতে ভাসতে শহীদ মিনারে পৌছেই টের পেলাম আমার ভয়ানক কান্না পাচ্ছে। কেন এমন হল বুঝতে পারলাম না। হয়ত লাল লাল ফুলের রংয়ের সংগে তাজা রক্তের সাদৃশই এর কারণ হতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কোন ঘটনা যে আগে থেকেই ছায়া ফেলতে পারে তা আমি তখন বুঝতে পারিনি। ফুল দিয়ে শহীদদের শ্রদ্ধা জানানো এমন গতানুগতিকতায় পরিণত হয়েছে যে সেখানে কাউকে কোনদিন কাঁদতে দেখিনি। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। রমনা ঘুরে যখন একাডেমীর এক চায়ের দোকানে চা গিলছি তখনই আমার অফিসের আজিজুর রহমানের সংগে দেখা। তাকে এ জায়গায় এর আগে কোনদিন দেখিনি। তার হাতে একখানা দৈনিক পত্রিকা। আমার পাশে একটা চেয়ারে বসে বললেন, আরে মুরাদ সাহেব যে? মনে মনে আপনাকেই খুঁজছিলাম।

আমি নিরুত্তাপ কণ্ঠে জানতে চাইলাম—কেন বলুন তো?

এক কাপ চা যদি খাওয়ান তো বলতে পারি। গিন্নীর জ্বালায় সকালের চা'টা পর্যন্ত ভাল করে খেতে পারিনি।

একবার বলতে চেয়েছিলাম—আমাকে দিয়ে আপনার কি দরকার আর তার জন্য আমি গাটের পয়সা খরচ করে চা খাওয়াব কেন? কিন্তু কিছুই না বলে বয়কে এক কাপ চা দিতে বললাম।

আজিজ সাহেব সেদিনের বিশেষ সংখ্যা দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের পাতাটা আমার দিকে মেলে ধরে একটা বিশেষ জায়গায় অংগুলি-সংকেত করলেন। . . . দেখুন ত আপনি কি না? শুনেছি আপনার বাবা সার্কেল অফিসার ছিলেন আর হার্টফেল করে মারা গিয়েছিলেন?

জরুরী বিজ্ঞপ্তিটি পড়লাম বিগত বায়ান্ন ইংরেজীর অকটোবর মাসে . . . থানার সার্কেল অফিসার জনাব আফসারউদ্দিন হার্টফেল করে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীও এক পুত্রসন্তান রেখে স্বামীর অনুগামিনী হন। সেই পুত্র যদি বেঁচে থাকে তবে তাকে নিম্নঠিকানায় অতি অবশ্য সাক্ষাৎ করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো

হচ্ছে। বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। নীচে নাম দেওয়া আছে কফিল উদ্দিন হাওলাদার। . . . নং ধানমণ্ডি। ফোন নং . . .।

চা'র দাম দিয়ে উঠে গেলাম। আজিজুর রহমান বললেন—উঠছেন যে? আপনিই নাকি? বোধহয় আপনার কপাল খুলে গেল। ডিটেক্‌-টিভ উপন্যাসে এ জাতীয় ঘটনা সমানে ঘটছে। এ রকম বিজ্ঞাপন দেখে গুপ্তধন পায় কিম্বা বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়। তারপর অবশ্য অনেক দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটে। শেষের দিকটা যেন আপনার বেলায় না হয়। চেনেন নাকি ভদ্রলোক কে—?

উত্তর দেওয়া আর প্রয়োজন মনে করিনি। আজিজুর রহমানের পত্রিকাখানার সেই পৃষ্ঠা আমার হাতেই রয়ে গেল। আমি হাটতে শুরু করলাম। এদিকে বাসের পথ বন্ধ, হাটতে হাটতে একেবারে পি, জি, হাসপাতালের সামনে এসে গেলাম। সেখানেও বাস না পেয়ে একটা রিকশায় চেপে বসলাম। ভাবাভাবির কারবার আমার চরিত্রে নেই। কিন্তু হাতের ঐ বিজ্ঞাপনটা আমার ভাবনার যন্ত্রটাকে চালু করে দিয়েছে। কে এই ভদ্রলোক? কি চান তিনি আমার কাছে? সত্যি কি বাবা কোন সম্পত্তি, ধন-দৌলত, টাকা-পয়সা রেখে গেছেন আমার জন্য? তিনি কি বাবার কোন বন্ধুজন ছিলেন? যদি ধনদৌলতই রেখে গিয়ে থাকেন তা হলে এখন কি হবে এসব দিয়ে? সময়কালে পেলে হয়ত অনেক কিছু হতে পারত। আমি যা হয়েছি তা হতাম না। শহরে থেকে ভাল স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে জীবনে কিছু একটা হতে পারতাম। অন্ততঃ বাবার মত এমনকি এর চেয়েও অনেক বড়? পিতামাতারা নাকি যা নিজেরা হতে পারেননি তাই চান ছেলেমেয়েদের মধ্যে আরও অনেক বড় অনেক বিদ্বান অনেক মানী? কিন্তু এমনও ত হতে পারে। হাওলাদার সাহেব বাবার কাছে টাকা পাবেন। বাবা কর্জ নিয়েছিলেন। তাই যদি হয় কত টাকা? আমি কি করে তা শোধ করব?

বাড়ীটা খুঁজে পেতে দেরী হল না। বিরাট গেটের সামনে রিকশাটা ছেড়ে দিলাম। গেটের পাশে চওড়া খামে হাওলাদার সাহেবের নাম, অবসরপ্রাপ্ত পদবী আর তার নীচে লেখা বড় করে বিওয়ার অব ফেরোশাস ডগ। হিংস্র কুকুর থেকে সাবধান। কুকুরকে আমি খুব ভয়

পাই। দমে গেলাম, কিছু সময় দাঁড়িয়ে থেকে গেটের লোহার আওয়াজ তুললাম। সংগে সংগে একজন লোক গেট খুলে বলল, আপনি কি সাহেবের সংগে দেখা করতে চান?

আমি মাথা নেড়ে হ্যা-সূচক ইঙ্গিত করলাম।

লোকটি আমাকে একটি বিরাট ড্রয়িং রুমে বসিয়ে ভিতরে চলে গেল। আমি ঘরটায় চোখ বুলালাম। প্রাচুর্যে থই থই করছে সারাটা কামরা। কিন্তু শ্রী নেই কোথাও।

একটু পরেই আমাকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল। ও-বাড়ীতে এই কাজের লোকটি ছাড়া অন্য কেউ থাকার যেন কোন স্বাক্ষর নেই। বাড়ীটা বড় বেশি ঠাণ্ডা। ওখানে ঢুকেই আমার শীত শীত করতে লাগল। অল্প সময়েই টের পেলাম আমার হাড়ের ভিতরও ঠাণ্ডার স্রোত বইতে শুরু করেছে।

কার্পেট পাতা একটা স্বল্প আলোকিত কামরার মধ্যখানে একটা পালং। তার উপর শুয়ে আছেন এক ভদ্রলোক। চুল দাড়ি নির্ভেজাল শাদা। সাইড টেবিলে অনেকগুলি শিশি, বোতল, প্যাকেট, পাশে একখানা চেয়ার। দেয়ালে আরবী ফার্সী ক্যালিগ্রাফীতে আল্লাহ মোহাম্মদ জাতীয় ফ্রেমে মক্কা মদীনার ছবি। বিছানার পাশে নির্মলতার প্রতীক ধবধবে শাদা পোশাকে একজন নার্স দাঁড়ানো। বৃদ্ধ হাতের ঈশারায় তাকে যেতে বললেন।

নার্স দায়িত্ববোধের দৃঢ়তায় বলল—আপনার হার্ট দুর্বল। একটু উত্তেজিত হলেই মহাবিপদ। আমি এখানেই থাকব।

হতাশার গর্তে বসে যাওয়া ঘোলাটে চোখ দুটো যেন আকুতির জোয়ারে বেরিয়ে আসতে চায়।...মহাবিপদ তুমি কাকে বলচ মা? এত আমার জন্য বিপদ নয়। সব শেষ হয়ে যাক, এইত আমি চাই। কিন্তু হতে দিচ্ছ কই? আমি ত শুধু ইনির সঙ্গে কথা বলার জন্যই বেঁচে আছি। এবার আর আমাকে আটকাতে পারবেনা। তুমি বাইরে যাও, মা।

মনে হলো খোঁড়া কবরের ঝুরঝুরে মাটির উপর দাঁড়িয়ে কথা বলছেন ভদ্রলোক। তার কথায় আমার মনে ভীষণ করুণ আর

সহানুভূতির ভাব জেগে উঠল। আহা কি এর এমন দুঃখ? আমি যদি এর অন্তিম মুহূর্তেও কিছুটা সান্ত্বনা দিতে পারি।

—তুমি বসো বাবা। দাঁড়িয়ে আছ কেন? তোমার নাম কি, কি কর?

আমি নিশিগ্রস্ত বিমূঢ়তায় আক্রান্ত। ঘরে আর কেউ নেই। ভদ্রলোকের মুখের কথা জড়িয়ে যায়। দু'একটি কথা বলেই থামেন আর হাঁপান?

বৃদ্ধ বললেন. আমি তোমার কাছে একটি ভিক্ষা চাইব, তা যদি দাও বাবা একটু সান্ত্বনা নিয়ে মরতে পারব।

আমি চেয়ার টেনে তার পাশে এগিয়ে গেলাম। একটা হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। তিনি আমার হাতটা চেপে ধরলেন। তার হিমশীতল হাতটা থর থর করে কাঁপছে।

আমি কোন কিছু চিন্তা ভাবনা না করে আবেগের বশেই বললাম, আমার কি আছে? তবু আপনি যা চাইবেন তা দেব। আপনি বলুন।

বৃদ্ধ বললেন, না বাবা, অত তাড়াতাড়ি কথা দিও না। আমার সব কিছু শুনলে তুমি ঘৃণায় হাত সরিয়ে ফেলবে। যদি আমার গলা টিপে মেরে ফেলতে চাও, তাও পারবে। কেউ বাধা দেবে না।

ভদ্রলোকের কথা সংলগ্নতা হারিয়ে ফেলে। বিছানায় উঠে বসতে চান। আমি বাধা দেই। আমার কেউ নেই। বিবি প্যারালাইসিসে বিশ বছর ভুগতে ভুগতে মরে বেঁচে গেছেন। ছেলে ব্যাংক ডাকাতি করে এখন জেলে। মেয়েকে সংগ্রামের সময় মিলিটারীরা ধরে নিয়ে গেছে। আছে না মরেছে জানি না।

আমার শুধু দুটো জিনিসের দরকার ছিল। টাকা আর প্রমোশন। দু'টোই পেয়েছি।

তোমার বাবা খুব তেজী আর নির্ভীক ছিলেন।

আমার অবাঙ্গালী বসকে খুশী করার জন্য সবই করতে পারতাম। মেয়েটাকেও নষ্ট করল তারাই।

আমার প্রচুর টাকা ছিল। এখনও আছে। ঢাকায় তিনখানা বাড়ী আছে। করাচী আর ইসলামাবাদের বাড়ী ত গেছে।

তোমার বাবা আর আমি এক জায়গায় ছিলাম। তা না হলে এবং তিনি বেঁচে থাকলে কবে ডিসি হয়ে যেতেন। আমিত লাফিয়ে লাফিয়ে প্রমোশন পেয়েছি। কিন্তু তোমার বাবা বেঁচে থাকলেও কিছুই হতে পারতেন না। সে পথ ত' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া আইয়ুব খানের প্রথম চার্জেই চাকরী চলে যেত।

তুমি যদি চাও তোমাকে আমি প্রচুর টাকা দেব। এলিফেন্ট রোড বা মগবাজারের একটা বাড়ীই দিয়ে দেব। চাও ত এ বাড়ীটাও নিয়ে নিতে পার। আমিই যখন থাকব না তখন এ বাড়ী দিয়ে কি হবে। কিন্তু টাকা পয়সা বাড়ী গাড়ী দিয়ে কি সব কিছুর খেসারত দেওয়া যায়?

তোমার বাবা ছিলেন খাটি বাংগালী। আমাকে বোঝাতেন নিজের ভাষার মর্যাদা না দিতে পারলে আমরা অন্যের দাস হয়ে থাকব। আমি বুঝতাম কিন্তু মানতাম না। কথা কাটাকাটি হত।

নাইনটিন ফিফ্‌টি টু'তে ঢাকায় গণ্ডগোলের পর ওখানকার স্কুল কলেজের ছেলেরা সভা করল। সিরিয়াস বক্তৃতা দিল। আমি খুব লাঠি পেটা করলাম। একজনের ত দু'টা পা'ই এমন করে ভাংগল যে ডাক্তার বললেন কেটে ফেলতে হবে। আমার মোটেই দুঃখ হয়নি। গর্ববোধ হল। 'বস' পিঠ চাপড়ালেন।

শুনছ? শুনছ? ঐ খট খট আওয়াজ? দু'টা ক্রাচ বগলে দিয়ে আমার ছাদের উপর হাটছে আর ভিক্ষে করছে। শোন, শোন কান পেতে শোন। গর্তের ভিতর থেকে চোখের মণি দু'টো বড় বড় হয়ে লাফালাফি করে অস্থির যন্ত্রণায় যেন বেরিয়ে আসতে চায়। কি যেন খুজছেন তিনি তারপর হৃদয় বিদারক একটা গোঙানীর শব্দে আমি সিস্টার সিস্টার বলে চীৎকার দিয়ে উঠলাম। পর্দার ওপাশেই বোধ হয় নার্স দাঁড়িয়েছিল। তাড়াতাড়ি কি একটা ওষুধের ফোটা চামচে করে তার মুখের মধ্যে প্রায় জোর করেই দিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ আমি মূহ্যমান হয়ে রইলাম। কিছুই ভাবছিলাম না। একটা চেতনারুদ্ধকারী পরিস্থিতিতে আমি জড়পদার্থ হয়ে বসে আছি।

চোখ দু'টো কিছু স্বাভাবিক হয়ে এলে নার্স আমাকে সরিয়ে দিতে চাইল। তিনি ইশারায় বেশ কড়া প্রতিবাদ করলেন। তারপর বললেন

সবগুলি পত্রিকার অফিসে ফোন করে বলে দাও এ বিজ্ঞাপন যেন আর না ছাপে।

হাওলাদার সাহেব আবার আমার হাতটা চেপে ধরলেন। আমি টের পেলাম একটা কংকালের মুঠিতে আমার হাত আটকা পড়েছে। ঠাণ্ডা আর শক্ত।

আমার এক পীর সাহেব আছেন। বড় বুজুরগ আর কামেল পীর। তার কাছে তওবা করেছি। তিনি বলেছেন, কাউকে যদি জীবনে আঘাত দিয়ে থাকি তাহলে তার কাছে মাফ চাইতে হবে। সে মাফ দিলে আল্লাহও মাফ করবেন সহজে। কিন্তু তাকে কোথায় পাব? তার সঙ্গে দেখা করার জন্যই ত দিন গুণছি। কিন্তু ডাক্তার তার কাছে যেতে দেবে না। একি জুলুম বল ত? হঠাৎ তোমার কথা মনে হল।

তোমার আববা স্কুল কলেজের ছেলেদের বাংলা ভাষার জন্য খুব উৎসাহ দিতেন। তাদের প্রতিবাদ সভায় তিনি পুলিশী জুলুমের নিন্দা করলেন। তিনি ছিলেন বলে সেদিন আমি লাঠিচার্জ করতে পারলাম না। গুণ্ডা দিয়ে মারধর লাগিয়ে সভা ছত্রভংগ করে দিলাম।

তার বিরুদ্ধে বড় সাহেবের কাছে ঘটনাকে ফেনিয়ে সত্য মিথ্যার ভেজাল দিয়ে নজির খাড়া করে তাকে দেশদ্রোহী, রাষ্ট্রের অখণ্ডতা বিনষ্ট-কারী ইত্যাদি ভাষণে আখ্যায়িত করে গোপনীয় রিপোর্ট পাঠালাম তার, অবাংগালী ডিসির কাছ থেকেও তিনি কোন মদদ পেলেন না।

আমি প্রমোশন পেয়ে চলে গেলাম। এরপর থেকে আমার উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে ওঠা দ্রুততর হয়ে উঠল। উপরওয়ালাদের খুব প্রিয় ব্যক্তি আমি আর সেই সুবাদে আমার সাত খুন মাফ। আমার ডান হাত বাঁ হাত এক হয়ে গেল।

আফসারউদ্দিন সাহেবের বিরুদ্ধে প্রসিডিং ড্র করা হল। তিনি কড়া জবাব দিলেন। তাঁর মতে তিনি অটল। খুব বিদ্বান আর শক্ত চরিত্রের লোক ছিলেন।

—আমাকে এক গ্লাস পানি দেবে বাবা? বুকটা জ্বলে যাচ্ছে। পানি, এক গ্লাস পানি।

আমি সিমেন্টে গড়া মূর্তির মত চেয়ারের উপরই জমে পাথর হয়ে গেছি। হাওলাদার সাহেবের মুঠায় আমার হাতও আটকে গেছে।

নার্স দৌড়ে এসে এক গ্লাস পানি এগিয়ে দিল। তিনি ডান হাত দিয়ে ধাক্কা দিতেই গ্লাস ছিটকে মেঝেয় পড়ে খান খান হয়ে ভেংগে গেল। তিনি গলায় সমস্ত শক্তি জড়ো করে চীৎকার দিয়ে উঠলেন। নট ইউ, নট ইউ।

বৃদ্ধ আমার হাতটাকে টেনে নিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করলেন। নার্স তার পিঠ আর ঘাড়ের নীচে বাড়তি বালিশ দিয়ে মাথাটাকে উচু করে দিল। তিনি হাঁপাতে লাগলেন।

নার্স আরেকটা গ্লাস এনে আমার হাতে দিল। আমার হাত বাড়াতে বেশ শক্তি লাগল। দু'এক ঢোক পানি তিনি গিলে ফেললেন। বাকীটা গালের দুদিক বেয়ে গায়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। তিনি মুখ দিয়ে একটা তৃপ্তিসূচক আওয়াজ বের করলেন, আঃ।

আমি লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠছি। বাড়ীর পর বাড়ী করছি।

আর তোমার বাবা? সরকার কয়েক মাসের মধ্যেই তাকে কঠিন শাস্তি দিল। সেই চিঠি পেয়েই তার দুর্বল হৃদযন্ত্রের কিয়া বন্ধ হয়ে গেল। আই অ্যাম এ মার্ডারার। আমি তোমার বাপকে হত্যা করেছি। কিলমি অর ফর গিভ মি। ফর গিভ? ক্যান ইউ? নো, নো, ইউ ক্যানট। পিতার হত্যাকারীকে কেউ ক্ষমা করতে পারে? পারে না।

মনে আছে আমি নার্স বলে চীৎকার দিয়েছিলাম।

চোখ মেলে যখন চাইলাম তখন লতিফা আর কবি আমার পাশে বসা। জায়গাটা হাসপাতালের ওয়ার্ড। আমি কি এতক্ষণ দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম?

আমি এখানে কেন? হাওলাদার সাহেব কোথায়?

লতিফা আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, ডাক্তার চুপ করে থাকতে বলেছেন। হাওলাদার সাহেব নেই, তিনি মারা গেছেন। ধানমণ্ডী থেকে একজন নার্স তোমাকে এখানে নিয়ে এসে অনেক কষ্টে আমাদের খবর দেন। তোমার পকেটে তোমার আইডেন্টিটি কার্ডটা ছিল। অফিসের ঠিকানা দেওয়া।

তার পর?

তুমি প্রায় তিনদিন অজ্ঞানের মত ছিলে। মাঝে মাঝে জড়িয়ে

জড়িয়ে কি যেন বলতে। একটা কথা কিন্তু বুঝেছি—তুমি ফুল দিতে চাও। শহীদ আফসারউদ্দিনের কবরে।

—লতু লতু। আমি বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। লতু আমি একটু ভাল হলেই তোমাদের নিয়ে আমার বাবা মার কবরে ফুল দিতে যাব। প্রতি বছর যাব।

লতিফা আমার বুকে মুখে চুলে পরম আদরে হাত বুলাতে বুলাতে বলল নিশ্চয়ই যাব। তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? ডাক্তার ডাকবো?

হাসি

সাইয়িদ আতীকুল্লাহ

এক

দিগন্ত রেখার একটু উপরে এখন লাল সূর্য। পরিপূর্ণ, বৃত্তাকার নীহার খালার ঘুম ভাঙে।

পূবের খোলা জানালা দিয়ে সকাল বেলার কাঁচা রোদ অবাধে গড়িয়ে পড়ছে ঘরের মেঝেতে। বাইরে এখন নির্মল আকাশ, ঝকঝকে আলো। ঘুম ভাঙতেই মনটা তার খারাপ হয়ে যায়। চারিদিকে রোদ উঠে গ্যাছে কতো আগে। ঘুরে ফিরে মনটা কেবলি খুঁত খুঁত করতে থাকে। সূর্য ওঠার আগে শয্যা-ত্যাগ করা তার নিয়মিত অভ্যাস। ব্যতিক্রমটা তার মনকে পীড়া দেয়—কোন অবস্থাতেই তিনি ব্যতিক্রমকে মনের সাথে মানিয়ে নিতে পারেন না।

হাত মুখ ধুয়ে ফিডিং বোতলে গরম দুধ ভরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে নীহার খালা ঘরে আসেন। দু'বৎসরের ছেলে মন্টু। হাঁটতে শিখেছে অবধি ভোর বেলা তার কাজেরও অন্ত নেই। মায়ের অজান্তেই সে এক সময় বিছানা ছেড়ে উঠে যায়। ঘুমন্ত কাকের ডানা ঝটপটানো শুরু হয় তার অনেক পরে। আবছা অন্ধকারে মন্টু এঘরে ওঘরে ঘুর ঘুর করে ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে। কখনো ব্যস্ত, কখনো ধীর মন্থর। বড় আপার টেবিলে যেয়ে গোটা একখানা বই অথবা খাতাপত্র ছিঁড়ে ছেঁড়া কাগজের স্তূপ বানায়। এই দিয়েই আজকাল সে দিন আরম্ভের একটা নিয়ম দাঁড় করিয়েছে, মন্টুর বিরুদ্ধে শেফালির ক্রমাগত নালিশ থেকে অন্ততঃ তাই মনে হয়।

নীহার খালা ডাকেন ঃ মন্টু—উ।

ঃ উঃ।

মিষ্টি গলায় সাড়া আসে পাশের কোনো ঘর থেকে।

ঃ কোথায় তুমি?

দক্ষিণের ঘরটার দরজা দিয়ে আবির্ভূত হয় মন্টু।

ঃ কি মা মণি?

ঃ কি আবার? এখন তুমি দুধ খাবে মা মণি।

মায়ের কোলে মুখ গুঁজে অকারণে মাথা ঝাঁকায় মন্টু। পায়ের গোড়ালি দিয়ে মেঝে ঠোকে। তারপর আবার বেরিয়ে পড়ে। ছোট্ট হাত নাড়িয়ে অসম্মতি জানায়। মুখেও বলে ঃ না মা! না মা!!

ঃ হ্যাঁ মা! হ্যাঁ মা!!

নীহার থালা মন্টুকে টেনে আনেন। বিছানায় শুইয়ে ফিডিং বোতলটা মুখে পুরে দেন। গোয়ার্তুমি থামিয়ে শান্ত সুবোধ লক্ষ্মী ছেলেটির মতো মন্টুও চুপচাপ রবারের বাটটা মুখে পুরে চুক চুক শব্দ তুলে দুধ টানতে থাকে। অবশ্যি পায়ের মৃদু নাড়াচাড়ার বিরাম পড়ে না।

ঃ তুমি ধরে ধরে খাও। হ্যাঁ, তুমি কতো লক্ষ্মী। তারপরে চলো বেড়াতে যাবো।

মন্টুকে বিছানায় রেখে নীহার থালা পশ্চিমদিকটার ঘরটাতে উঁকি দিতে গিয়ে দেখেন ঘরে এখনো আলো জ্বলছে। মনে কেমন খটকা লাগে। কোনো প্রকার শব্দ না করে নীহার থালা সাবধানী পায়ে টিপে টিপে ঘরে ঢোকেন। ঘরের অবস্থা দেখে স্তব্ধ হয়ে যান। সারারাত এখানে এত কিছু হয়েছে। পাশের ঘরে থেকে এর বিন্দুবিসর্গও তিনি জানেন না। লাল, নীল, কালো, সবুজ, বেগুনী, হলুদ কালির মেঝেময় ছড়াছড়িটা দেখবার মতো। তক্তপোষের নীচে, এখানে সেখানে স্তূপ করা খবরের কাগজ ও কালি লেপা। নীহার থালার কৌতূহল আর কিছুতেই বাগ মানে না। একটা স্তূপের পাশে তিনি বসে পড়েন। একটার পর একটা কাগজ উল্টাতে থাকেন।

ঃ রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই! বাংলাভাষা জিন্দাবাদ!!

ঃ ভাষার উপর হামলা চলবে না! ফ্যাসিস্ত নাজিম নিপাত যাও!!

ঃ ২১শে ফেব্রুয়ারীর ডাক ঃ সাড়া দিন।

ঃ আজকের হরতালকে সাফল্যমণ্ডিত করুন।

ঃ নাজিম চক্রান্তকে ব্যর্থ করুন। সরকারী হামলাকে রুখে দাঁড়ান।

ঃ সভা-শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করুন।

ঃ বাংলাভাষা জিন্দাবাদ।

আরেকটা কাগজ টেনে নেন নীহার থালা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে।

ঃ উর্দু-বাংলা ভাই ভাই!

ঃ নাজিম-নুরুল চুক্তি রাখ অথবা গদী ছাড়!!

পোস্টার পড়তে পড়তে নীহার খালা নিজেও উত্তেজিত হয়ে পড়েন। দু'কানের ভেতরটা তার ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে, মনে হয় শিরায় শিরায় রক্ত যেন টগবগ করে ফুটছে। মাঝে মাঝে সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তার স্নেহশীতল ছায়াময় চোখ বিস্ফারিত হয়। ত্বরিৎ ক্ষিপ্রতায় আরেক বাণ্ডিল খুলে ফেলেন। হঠাৎ চোখ ঝলসে দেয় লেখাগুলো।

ঃ ভাষা সমস্যা আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা। কশাইয়ের ছুরি থেকে বাংলা ভাষাকে বাঁচাবোই।

ঃ মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়া চলবে না।

ঃ অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ।

পোস্টার পড়া শেষ হয় নীহার খালার। লঘু পায়ে সরে এসে তিনি আবুর শিয়রে দাঁড়ান। উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত চোখজোড়া তার জ্বলতে থাকে রাত্রি শেষের দপদপে দুটি তারার মতো। অভিভূত অবস্থায় এক দৃষ্টে তিনি চেয়ে থাকেন আবুর মুখের দিকে। ঘুমন্ত মুখটাকে বড়ো ক্লান্ত মনে হয় তার কাছে। ঘুমেও উদ্বেগ উৎকণ্ঠা মুছে যায়নি, সারা-রাত্রির অনিদ্রাজনিত অতৃপ্তি মেঘেময় কালির গাঢ় দাগের মতো ছোপ ছোপ লেগে রয়েছে। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অতৃপ্তি, অশান্তি সারা মুখে তারি গভীর চিহ্ন। মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য নির্মম আঁচড়ে মুখের বিষণ্ণতাকে আরো ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। এর ভিতর থেকে আবুকে তার কাছে আরো বেশি পরিচিত বলে মনে হয়ঃ তার উগ্র ব্যক্তিত্ববোধ আর একটা গভীর আত্মপ্রত্যয় ঘুমন্ত মুখের অভিব্যক্তিতে, শানানো নাকে, কপালে আর ভুরুর একটানা বিষণ্ণ পটভূমিতে খাপ-খোলা রৌদ্রের তরবারীর মতো তীব্র জ্যোতি ঠিকরোচ্ছে। মুখে এক আশ্চর্য দৃঢ়তা; অনমণীয়।

একতাল ঠাণ্ডা পাথরের স্তব্ধতা বুকে পুরে নীহার খালা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। মৃদু দুপ দুপ আওয়াজ তুলে বুকের ভিতরে জোড়া হৃদপিণ্ডটা নড়ছে। হঠাৎ তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরয় না। বুনো ভ্যাপসা অন্ধকারের পথ হারিয়ে যাওয়া হাওয়ার আবেগে একরাশ অচেনা ব্যথা বুকের ভিতর কেমন উচ্ছৃংখল হয়ে ওঠে, উদ্দাম আবেগে হৃদয় মন আলোড়িত হতে থাকে।

রাত্রেও আবুর এতো কাজ।

দুরন্ত ছেলে। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়। মাঝেমাঝে কোন সময় যখন এসে হাজির হয় চেহারার দিকে তখন তাকানো যায় না।

রাস্তায় রোদ, বাতাস আর ধূলি নির্দয় চাবুকে ক্ষতবিক্ষত করে ওকে ঘরে পাঠিয়ে দেয়। তখন তার চেহারাটা হয় ঝোড়ো কাকের মতো। মাস্তুল ভাঙ্গা পাল ছেঁড়া, তলা ফুটো জাহাজের জীর্ণতার মতো করুণ।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে নীহার খালা আবুর মাথার কাছে বসে পড়েন। ফিডিং বোতল রেখে মন্টু এসে হাজির হয়। মাকে দেখেই নিঃশব্দ হাসিতে তার মুখ ভরে যায়, চোখের তারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নীহার খালা তাড়াতাড়ি দুই ঠোঁটের মাঝখানে তর্জনী স্থাপন করেন, চোখের মণি উপরের দিকে ঠেলে দেন। মন্টু এতোদিন মায়ের ব্যবহৃত এই বিশেষ সঙ্কেতটা বুঝে ফেলবার মত বুদ্ধি আয়ত্ত করেছে। কথা বলতে মানা। মন্টু হতভম্ব হয়ে যায়।

দুধটা তো সে খেয়েই এসেছে। তবু মায়ের এই অনাত্মীয় ব্যবহার। আশ্চর্য্য হবার মতো বৈকি!

কালি লেপটানো কাগজ, রঙের ডিবা, ব্রাশ, তুলি, ঘরময় নানান রঙের ছড়াছড়ি দেখে মায়ের তর্জনী স্থাপনের ইঙ্গিতময়তাকে সে এক মুহূর্তে দিব্যি ভুলে বসে। হাততালি দিয়ে সে লাফিয়ে ওঠে ঃ বা! বা!!

নীহার খালা আবার আঙ্গুল রাখেন ঠোঁটের মাঝখানে, বড় করেন চোখের মণি।

কথা বলতে মানা। গোলমাল করতে মানা। ব্যাপারটা গোলমেলে দেখে নির্লিপ্ত ভালো মানুষটির মতো অগত্যা মন্টু ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এসবে তার পোষাবে না।

চুলে আঙ্গুল ছোঁয় কি না ছোঁয় এমনিভাবে আবুর মাথায় হাত বুলোতে থাকেন নীহার খালা। অতি সাবধানে আস্তে আস্তে যেন আবুর ঘুম ভেঙ্গে না যায়। মাথা ভরতি ওর ঝাঁকড়া চুল, ধূ ধূ মাঠের দুপুরে একটা নির্জন আঁশ-শেওড়া গাছের মতো। কেমন যেন রহস্যঘেরা। চুলগুলি পাকা কাশফুলের মতো নরম, মসৃণ, তৃপ্তিদায়ক। মাথায় হাত বুলোতে

বুলোতে অসম্ভব তৃপ্তির একটা ভরাপূর্ণিমা যেন তার বুকের ভিতর উথলে উঠল। বাঁধ না মানা জ্যোৎস্নার জোয়ারে ভরে দিয়ে গেলো। তার কল্পনা করতে ভালো লাগলো এমন একটা দৃশ্য ঃ দূরের কোন দেশ যেখানে বৃষ্টি নেমেছিলো মায়ের স্নেহের মতো অকৃপণ ধারায়। এখানে একটা নির্জন অপরাহ্ন। দূরের সেই বৃষ্টিধোয়া দেশ থেকে অজস্র প্রবাহে নেমে আসছে ঠাণ্ডা হালকা হাওয়া, ফুলে ফুলে উঠছে নির্জন সন্ধ্যাটি। একটু একটু করে এগিয়ে আসছে এমনি একটি নিটোল মুহূর্ত যখন তিনি হাওয়ায় হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছেন আবুর চুলগুলো।

মুখ বিকৃত করে আবু ঘুমের মধ্যে নড়েচড়ে ওঠে। নীহার খালার কল্পনায় বাধা পড়ে। সশব্দে একটা ঢোক গিলে আবু পাশ বদলায়। শব্দটা গিয়ে নীহার খালার কলজেয় আঘাত করে। বাধা পেয়ে কল্পনার যে রেশটুকু মনের ভিতরে ছায়ার মতো অবশিষ্ট ছিলো তাও মিলিয়ে যায়। ব্যথায় বুকটা হঠাৎ চড় চড় করে ওঠে—চিড় ধরে ভিতরে কোথাও। আবুর মুখের দিকে তাকাতেই দুচোখের পাতা ভারী হয়ে ওঠে পানিতে। এত কষ্ট আবুর!

নীহার খালা দুহাতে মুখ ঢাকেন। বোবা কান্না ফেনিয়ে ওঠে। তার অগোচরে, চোখের আড়ালে আবুর এতো কাজ।

সারাদিন সে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। মিটিং করে এখানে সেখানে। মিটিংয়ে কথা শোনে। মিটিংয়ে বক্তৃতা দেয়। সেখানে তিনি তার নাগাল পান না। রাত্রেও তার কাজ শেষ হয় না। পোড়া দেশ, মানুষকে পাগল বানিয়ে পথে বিপথে ঘুরিয়ে মারার মতো কত কিছুই আছে চারিদিকে।

বহু রাত্রেই আবু ঘুমোয় না, এটা তার নজর এড়ায় নি। তা জেনেও তিনি নিরুপায়, ওর দুর্বোধ্য জেদের কাছে তাকে হার মানতেই হয়। যেদিন সে টের পায় যে নৈশ বিশ্রামের জন্য নীহার খালার পীড়াপীড়িটা বিরক্তিকর হয়ে উঠবে সেদিন সে কৌশলের আশ্রয় নেয়। গল্প করতে করতে খালাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে সে আস্তে নিজের ঘরে চলে আসে। দরোজায় খিল এঁটে ইচ্ছামতো কাজ করে।

আবু কিছু না করে ভাল ছেলের মতো হাত-পা গুটিয়ে নির্বিকার থাকুক তা তিনি চান না। তাহলে আবুকে আবু বলেই চেনা যাবে না।

ব্যস্ততা, উচ্ছৃংখলতা, অবাধ্যতাই তার চরিত্র, সেখানেই তিনি তাকে দেখতে চান. তবে তারও একটা সীমা থাকা উচিত, এটুকুই শুধু তার প্রার্থনা। আবুর সব কিছুতে একটা সীমাই যদি না থাকলো তবে নীহার খালা আছে কি করতে!

ইচ্ছা করলে আবু নীহার খালার কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্যও নিতে পারে। তাতো সে করবেই না বরং উল্টো আশ্চর্য নিষ্ঠুরতায় তার সহাদয় ইচ্ছাকে এড়িয়ে একা একা তার কাজের অকাজের পাহাড়ে পথ হাতড়ে মরবে।

এ্যালার্ম ঘড়িটায় একটানা শব্দ বাজতে থাকে। পুরনো ঘড়ি। মনে হয় শব্দটা কোথায় যেন খরখরে পাঁজরের ভিতর থেকে উঠছে। তীক্ষ্ণ মুখে অগুণতি লোহার পা-অলা কোন সরীসৃপ দ্রুতবেগে টিনের চালে চলাফেরা করলে যেমন শব্দ হয় ঘড়ির শব্দটাও তেমনি বীভৎস, ভয়াবহ লাগে নীহার খালার কানে। বুকটা কেমন ধড়াস করে ওঠে। নীহার খালা চমকে উঠে তাকিয়ে দ্যাখেন সকাল সাড়ে আটটা।

ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসে আবু। চোখ দুটো নিষ্প্রভ জবা ফুলের মতো। ঘোলাটে লাল। চোখের স্নায়ুতে অসমাপ্ত নিদ্রার আক্রমণ, তাই ভালো করে তাকাতে পারে না। দুহাতে সে চোখ রগড়ায় আর এই ফাঁকে আবুর অলক্ষ্যে নীহার খালা নিজের ভেজা চোখ মুছে নেন আঁচলের প্রান্ত দিয়ে। কেননা কারো কান্না আবু সহ্য করতেই পারে না, ক্রন্দননিরত যদি আপনার অতি পরিচিত কেউ হয় তাহলে সে একেবারে ক্ষেপেই যায়। অপরিচিত কাকেও কাঁদতে দেখলে ওর মনটা ভারী হয়ে যায়। মুখটা হয় থমথমে। সারাদিন সে খারাপ ব্যবহার করে মানুষের সাথে। খেতে পারে না, ঘুমোয় না। সব সময় ছটফট করে, নিরিবিলি কাঁদেও। এসব কথা নীহার খালার অজানা নয়।

তাই, তাড়াতাড়ি তিনি যতটা সম্ভব স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করেন। মুখে ফুটিয়ে তোলেন এক টুকরো হাসি। প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও মনের বিপন্ন দশাটা হাসির আড়ালে ঢাকা পড়ে না। সেজন্য মনে মনে শঙ্কিত হন খানিকটা। আবু চোখ মেলেই দ্যাখে সামনে দাঁড়িয়ে নীহার খালা। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে: আরে খালা! তুমি?

কলকণ্ঠ আবু আনন্দে চীৎকার করে ওঠে। ত্রস্ত পায়ে সে উঠে আসে নীহার খালার কাছাকাছি। তার উচ্ছ্বাসটা হঠাৎ দপ করে নিবে যায়। মুখে ফুটে ওঠে কঠিন ব্যঞ্জনা। কপালের যে মোটা রগটা এমনিতে দপদপ করছিলো সেটা ফুলে ওঠে। আবু ফুঁসে ওঠে অনেকটা।

ঃ খালা!

ঃ কি রে!

হেসে জিজ্ঞাসা করেন নীহার খালা। যা আশংকা করেছিলেন ঠিক তাই। আবু বল্লেঃ কি আবার! আজকাল দেখছি হাসতেও পারো না। কিছুদিন থেকেই দেখছি! জানোই তো আমার জন্যে তোমার কোন অসুবিধে হোক তা আমি চাইনে। শুধু বল্লেই পারো। অমন কান্নার মতো হাসার দরকার কি?

আবু উত্তেজিত হয়ে পড়ে, আর যেন যে সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে তা তিনি জানেন। কোনো ব্যাপারে অসম্পূর্ণতাও সহ্য করতে পারে না। তাই কাউকে হাসার মতো করে কাঁদতে দেখলে কিংবা কাঁদার মতো হাসতে দেখলে ও ক্ষেপে যায়। এতগুলো কথার সামনে নীহার খালা হকচকিয়ে যান। কোনো রকমের অস্বস্তি কাটিয়ে বলে ওঠেনঃ পাগল! কান্নার মত হাসা অথবা হাসার মত কান্না, কেমন যেন কবিতা হয়ে গেল না? আমি তো পারিইনে। তুই হেসে শিখিয়ে দেনা!

ঃ দাঁড়াও! এখানে বসে থাকো। আমি মুখ ধুয়ে আসি। খবরদার যেয়ো না যেন!

ঃ নড়লে বুঝি ঠ্যাঙ্গাবি?

ঃ হ্যাঁ, তাই!

গম্ভীরভাবে কথা কটি বলেই আবু বেরিয়ে যায়। হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে আসে মন্টুকে কোলে নিয়ে। মন্টুকে কোলে নিয়ে মুহূর্তেই সে বদলে গ্যাছে, একটু আগের ক্ষোভ কিংবা গাম্ভীর্য কোন কিছুর চিহ্নই আর মুখে নেই। দুই ভাইয়ে মেতে উঠেছে। নীহার খালা স্বস্তি অনুভব করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ আবু! তোর বুঝি রাতদিন অনেক কাজ?

নীহার খালার কথা ভারী হয়ে আসে।

মন্টুকে মেঝেতে দাঁড় করিয়ে আবু পোস্টারগুলো গুছিয়ে নেয়। সবগুলি মিলিয়ে দড়ি দিয়ে একটা বাণ্ডিল তৈরী করতে করতে উত্তর দেয়ঃ হ্যাঁ খালা অনেক কাজ।

ঃ অনেক কাজ! হ্যাঁ!

তার কথা জড়িয়ে আসে। নিঃঝুম বুকটা টিপটিপ করতে থাকে। আর কিছু বলতে পারেন না। অসহায় দৃষ্টির মাঝখানে আবুর চেহারাটা ঝাপসা হয়ে ওঠে। আবুর অলক্ষ্যে নীহার খালা আরেকবার চোখ মুছে নেন।

কালুর মা চা দিয়ে যায়। একটা পিরিচে আনুষঙ্গিক দু টুকরো মাখন রুটি আর সেদ্ধ ডিম। বাণ্ডিলটা দেয়ালের সাথে খাড়া করে দিয়ে আবুও উঠে দাঁড়ায়।

গরম চায়ের সধুম বাটিতে চুমুক দেয় প্রাণপণে।

ঃ কি রে খালি চা খাচ্ছিস যে? ডিম-রুটিটা আগে—

হঠাৎ নীহার খালা থেমে যান।

ঃ হ্যাঁ, তারপর? থামলে কেন খালা? হাসতে হাসতে আবু বলে ওঠে।

তবু নীহার খালা কোন কথা বলেন না। কথা বলতে বলতে হঠাৎ কেন যে তিনি থেমে গেলেন তা আবু বুঝতে পারে। বয়স হলেও এমন একটু আধটু ছেলেমানুষী করার মতো মনের সজীবতা তার আছে। আবুর তা ভালোও লাগে এই জন্য যে, অন্য মেয়েদের মতো এটা তার ন্যাকামী নয়। নিজের খালা এজন্য তার গর্ববোধও আছে।

ঃ সাব্বাস মেয়ে। কাজ বিবেকের কথাটা বুঝি ভোলো নি। হু। বুঝতে পাচ্ছি স্মরণ শক্তি তোমার খুব প্রখর। য়্যুনিভার্সিটিতে পড়লে কালী-নারায়ণটা ঠিকই পেতে।

ঃ কালী-নারায়ণ-টারায়ণ আমি চাইনে।

ঃ তবে কি চাও?

ঃ কিসস্ না।

নীহার খালা মুখটাকে ফিরিয়ে নেন অন্যদিকে। কোথা থেকে রাজ্যের কান্না এসে বুকে চেপে বসে ভারী পাথরের মতো।

গতকাল বিকেলের ঘটনাটা এমন কিছু নয়। তবু নীহার খালার খুব লেগেছিলো। বাড়ির বাইরে ঘোর সন্ধ্যা, ভিতরে ঘরে ঘরে অন্ধকার ঘোরতর।

উশকো খুশকো চুল, কঠিন মুখ। আবু কোথা থেকে ঘরে ঢুকলো। একটা প্লেটে খান দুই শুকনো রুটি আর পাটালি গুড়ের চাক নিয়ে নীহার খালা ঘরে ঢুকলো। মাখন ফুরিয়ে গ্যাছে সকালেই। অফিস ফেরতা খালুজানের ভুলে তা আনা হয়নি। তাই বিকেল বেলা পাউরুটি আনার কথা নীহার খালা বলেন নি। আটা দিয়ে রুটি করেছেন নিজেই, তা ছাড়া এ পন্থায় খানিকটা নতুনত্ব আছে বলেই নীহার খালার মনে হয়েছিলো। রোজকার একঘেঁয়েমি পাল্টে দিয়েছিলেন বলে আবুও আনন্দে লাফিয়ে উঠবে এমনি আশা করেই তিনি সারা বিকেল আবুর প্রতীক্ষা করছিলেন। ভেবেছিলেন আবু হয়ত আনন্দের আতিশয্যে চেঁচিয়ে বাড়ীটাকেই খানিক-ক্ষণের জন্য মাথায় করে নেবে। এমনি আরো কত কিছুই কল্পনা করেছিলেন মনে মনে।

যা আশা করেছিলেন তেমন কিছুই হলো না। বারবার বলা সত্ত্বেও আবু রুটিটুকু স্পর্শ পর্যন্ত করলো না। নির্লিপ্ত উদাসীনতায় কাজের অজুহাত দিয়ে আবু এড়িয়ে গেলো। আশাভঙ্গটা নীহার খালার বুকে নিদারুণভাবে বেজেছিলো। এমন কি সে সময়ের জন্য গোটা পৃথিবীটাই তার চোখে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলো।

আজ রাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কালকের বিকেলটাই নতুন ব্যাথায় আবার ফেনিয়ে ওঠে নীহার খালার অন্তরে। অবশ্যম্ভাবী একটা যোগ-সূত্রও যেন তিনি খুঁজে পান মনে মনে। তা না হলে এমন হয় কেন?

নীহার খালাকে ছাড়া এক মুহূর্ত আবুর চলে না। তবু নিজের বোঝাটা, তা যত দুর্বহই হোক, সে একা একাই বইবে। কাউকে তার ধারে কাছে ঘেঁষতে দেবে না, নীহার খালার সাহায্য পাওয়া যাবে এজন্যই যেন সে কোনো কাজের কথা পর্যন্ত কোনদিন তোলে না। রাস্তায় অনেক লোকের সঙ্গেও সে একা, আর রাত্রিতে নীহার খালার কাছে থেকেও সে একা। কাজ করতে করতে আবু হয়তো পাগল হয়ে যাবে, তবু হয়তো নীহার খালার কাছে কিছু বলবে না। এমনি একটা অভিযোগ তার মনে তোলপাড় করতে থাকে। ভাবতে মনটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় যে,

এমনি করে আবু পরোক্ষভাবে তাকে উপেক্ষা করছে, ব্যঙ্গ করছে তার স্নেহ-মমতার অসারতাকে।

আবু উঠে আসে। অন্যদিকে ফিরিয়ে নেওয়া নীহার খালার মুখটাকে হাত দিয়ে সে ঘুরিয়ে নেয় নিজের মুখের দিকে ঃ আচ্ছা খালা। তুমি কি আমার উপর রাগ করতে পারো?

আবুর কথায় অনুশোচনার উত্তাপ। নীহার খালার হৃদয় ছুঁয়ে যায় গভীরভাবে। কথা না বলে প্রাণপণ শক্তিতে তবু তিনি চুপ করে থাকেন। ভয় হয় বলতে গিয়ে হয়তো তিনি ডুকরে কেঁদে উঠবেন, ভেঙ্গে পড়বেন চোখের পানিতে। কথা বলা ত হবেই না. আবুর মনটাও দুমড়ে যাবে। এক টুকরো রুটি এনে আবু তুলে ধরে খালার মুখের সামনে ঃ লক্ষ্মী খালা! খাও এই রুটিটুকু।

ভিক্ষা চাওয়ার বিশীর্ণ দীনতা ফুটে ওঠে আবুর মুখে। নীহার খালা একটু হেসে ফেলেন। তবু মনটাকে ঘুরিয়ে নিতে নিতে অসম্মতি জানান অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঃ না না।

কাল বিকেলের জের টেনে ওকে কষ্ট দেয়ার জন্য মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়েন। এতো সহজ মীমাংসায় সংকোচ বোধটা তাই বড় হয়ে দেখা দেয় তার মনে। তিনি জানেন আবু তাকে ভালোবাসে, আর ভালো-বাসে দুর্লভ অনুভূতি দিয়ে। এটাই তার একমাত্র কিংবা প্রথম প্রমাণ নয়, পিছনের সমস্ত দিনগুলিতেই, খুঁজলে অসংখ্য সাক্ষী পাওয়া যাবে।

আবু আর কিছু না বলে বাকী চা টুকু এক চুমুকে শেষ করে পাশের ঘরে চলে যায় নিঃশব্দে যেন বহু যুগের বিষণ্ণতায় ভরা একটা পাথরের মূর্তিকে সরানো হলো এক মন্দির থেকে আরেক মন্দিরে। বিছানায় উপুড় হয়ে সে বালিশে মুখ গোঁজে।

নীহার খালাও ঘরে ঢোকেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। এতো তাড়াতাড়ি আবু হাল ছেড়ে দেবে তা তিনি ভাবতে পারেন নি। তাই এতে শুধুমাত্র তিনি অপ্রস্তুত হয়েছেন তা নয় তিনি বিচলিতও হয়ে পড়লেন। দিনরাত্রি চব্বিশ ঘন্টায় ওকে কতটুকুই বা তিনি কাছে পান। এক টুকরো আগুনের ফুল্‌কি। হঠাৎ সে জ্বলে ওঠে, জ্বালিয়ে দেয়, পুড়িয়ে দেয়, হঠাৎ আবার নিবে যায়, নিবিয়ে দেয়। এর চেয়ে বেশি করে আবুকে আজো বলতে পারেন নি। একে বুঝে ওঠার কাজটা সহজ নয় নীহার

খালা তা মর্মে মর্মে অনুভব করেন। মনে হয় তার নিজের অনুভূতি ততটা গভীর নয়, তত তীক্ষ্ণ নয়। ওর ব্যাপারে বারে বারে তাই তার ভুল হয়, তিনিও নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। নিজের অসামর্থ্য সত্ত্বেও আবুর এই আকস্মিক চলে আসার সঙ্গে ব্যর্থতা জুড়ে দিয়ে ভাবতে তার কষ্ট হয়। মনটা কেমন যেন হাহাকার করে ওঠে। হৃদয়ে একটা অজানা আশংকার মন্থন চলতে থাকে। নীহার খালা ডাকেন ঃ আবু! আবু মুখ তুলে তাকায়। চোখে কেমন স্পৃহাহীনতা, দৃষ্টি ঘোলাটে। দেখেই বোঝা যায় একটু আগের ঘটনাকেই কল্পনার রঙে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সে নিজের মধ্যে এক বিশ্রী জটিলতার সৃষ্টি করেছে। আঘাত পেলেই ও এমনি হয়।

ঃ কি?

খালার দিকে নিঃশব্দে চেয়ে থাকতে থাকতে এক সময় সে মাথাটিকে আবার বালিশের উপর ছেড়ে দেয় ঃ কি বলবে বলো না! আর যদি কিছু না থাকে তো সরে যাও।

ঃ ওঘর থেকে খাবার ফেলে চলে এলি যে। কথায় মৃদু ভর্ৎসনার সুর। ব্যাপারটা হাল্কা করার জন্য নীহার খালা আশ্চর্যরকমভাবে সহজ হয়ে ওঠেন। ঝুপ করে বসে পড়েন বিছানার উপরে। একহাতে আবুর মাথাটা ঝাঁকাতে থাকেন।

ঃ বুঝলি আবু! তোর আমার ঝগড়াটা বেশ পুরানো। সেই কাল বিকেল থেকে শুরু! আর তুই কিনা ভাবলি যে এক কথাতেই তাকে মিটিয়ে ফেলবি! আমি তা মানতে পারি? তাহলে যে আমারি হার হয়ে যায়! তুইই বল জিতবার চেষ্টা আমি করব না? কথার শেষে নীহার খালা খিলখিল করে হেসে ওঠেন। আবুও যোগ না দিয়ে পারে না। সেও হেসে ফেলে। দু'জনের অজান্তে দু'জনের মনই হাল্কা হয়ে যায়।

অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে নীহার খালাকে চমকে দিয়ে দৈনন্দিনতার আরেকটা নতুন অধ্যায় চোখের সামনে আরম্ভ হয়ঃ দেখ খালা। তোমার ওই হেরে যাওয়ার কথাটা আগাগোড়াই মিথ্যে। তুমি বুঝি হার মানবার মতো মেয়ে? রোজ রোজ ত তুমিই জিতে যাও আর আমি হারি।

একটু থেমে সে আবার বলে কথার ফাঁকটা পূরণ করার জন্যঃ কি জান খালা, ওটা হারও নয় জিতও নয়!

দু'জনে তারা হাসতে থাকে। হাসতে হাসতেই নীহার খালা বলেনঃ জানিস আবু!

ঃ জানিতো অনেক কিছুই। কি?

ঃ তোর বুদ্ধি বড্ড কম।

ঃ কথাটা অপমানকর। তবু মানলাম। অন্য কেউ বললে মানতাম না। এমন কি হনুমানের মতো নমস্য জীব হলেও না। যাই হোক, তারপর?

ঃ তারপর? নীহার খালা এমনভাবে শরীর কাঁপিয়ে হাসতে আরম্ভ করলেন যে, দেখে মনে হয় মরে না গেলে তা আর থামবে না।

ঃ আরেকবার সাধলেই আমি খেতাম।

ঃ হ্যাঁ! 'আরেকবার সাধিলেই খাইতাম!' হো হো করে হেসে ওঠে আবু। গমকে দেয়াল যেন ফেটে যেতে চায়। দূরে কোথায় যেন ঘণ্টা পড়ে, ন'টা। আবু চমকে ওঠে, তার হাসি থামে। সে উঠে দাঁড়ায়।

ঃ হাসবার সময়টাই পেলাম না। থাকগে খালা, আমাকে ছ'আনা পয়সা দাও তো ঝটপট। তা না হলে এতগুলো পোস্টার নিই কি করে? পোস্টারগুলো সেঁটে শেষ করতে হবে। বারোটায় আবার মিটিং।

ঃ পয়সা দিচ্ছি। কিন্তু খেতে আসবিনে?

ঃ সময় হবে না। সে জন্য ভেবো না। আর আমার জন্য বসে থেকে সারাদিন না খেয়ে থেকো না কিন্তু।

ঃ আসবিনে কেন? না আসবি। নীহার খালা অনুযোগ করেন।

ঃ তোমার সাথে বসে খেতে আমারও ভালো লাগে না বুঝি? কিন্তু করব কি? সময় হবেনা আজ। তাই বলে তোমায় না খেয়ে শুকোতে হবে নাকি?

নীহার খালা ছ'আনা পয়সা এনে আবুর হাতে তুলে দেন। আর পকেটে গুঁজে দেন এক টাকার একটা নোটঃ টাকাটা দিয়ে কিছু খেয়ে নিস। মনে থাকে যেন আমার কথা। বুঝলি, খাবি কিন্তু মনে করে। কালিমাখা সার্ট-পাজামা বদলে যা। নীহার খালা নিজেই সার্টটা টেনে খুলে দিয়ে আরেকটা এগিয়ে দেনঃ এবার পাজামা বদলে নে।

নীহার খালা আবুর হাত ধরে আরেকবার অনুনয় করেন ঃ খেয়ে নিস বাবা। মনে থাকে যেন। আসলে কিছুতেই তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাকে ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে সে বসে খেতে পারবে। খেতে বসে কাছে নীহার খালা নেই দেখে হাত ঝাড়া দিয়ে সে হয়তো উঠে যাবে, বহুবার দেখেছেনও এমনি।

কাপড় পরে তৈরী হয়ে আসে আবু। চোখে-মুখে দারুণ ব্যস্ততা, দিনের আলোকে ওকে যেমনটি দেখা যায়। গলায় উৎকণ্ঠা নিয়ে নীহার খালা জিজ্ঞাসা করেন ঃ আবু চুয়াল্লিশ ধারা নাকি দিয়েছে?

ঃ হ্যাঁ। ভেবেছে চুয়াল্লিশ ধারার ধমকেই সব ফেঁসে যাবে।

ঃ চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙ্গতে গেলে মারবে যে।

ঃ সে ওদের মর্জি। আমরা ঠিক করেছি শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করবোই।

উদ্বেগে এবার নীহার খালা ভেঙ্গেই পড়েন ঃ আবু। তোকেও মারবে?

আবু অতি কষ্টে হাসিটাকে জমিয়ে রাখে ঃ আচ্ছা পাগল তো। পুলিশরা বুঝি জানে যে আমাকে মারলে নীহার খালার খুব কষ্ট হবে? না। না। না। অমন কাজ পুলিশের মত ফেরেশতারা কি করতে পারে?

নীহার খালা হঠাৎ তিরিক্ষে হয়ে উঠেন ঃ বেশ করে তোকে মার দিক।

ঃ ও মা। সেকি?

ঃ তুই তো আর কথা শুনবি না আমার।

ঃ তাই না? আবু হেসে ওঠে। পোস্টার নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে আবার ফিরে আসে ঃ খালা। খালা!! নীহার খালা রান্নাঘরে থেকে ছুটে আসেন ঃ কি, কিরে?

ঃ বিকেল বেলা যখন ফিরে আসবো তখন কিন্তু আবার হাসবো আমরা হ্যাঁ। হাসতে আমার খুব ভালো লেগেছিল। তোমাকেও কিন্তু খুব হাসতে হবে বুঝলে? হন্তদন্ত হয়ে আবু ছুটে বেরিয়ে যায়।

নীহার খালাও হেসে ফেলেন মনে মনে। বদ্ধ পাগল এই আবুটা। আর এই পাগলামিটাই ওকে এতো মিষ্টি করেছে তার কাছে। তাই

পাগলামি ছেড়ে যখনি সে ভালো মানুষের মতো স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তখনি ওকে অস্বাভাবিক লাগে, বুকের ভিতরটা খচখচ করতে থাকে।

দুই

য়্যুনিভার্সিটির মাঠ থেকে শহরের যে রাস্তাগুলি দেখা যায় তার উপর দিয়ে কয়েক হাত পর পর টহলদারী সশস্ত্র পুলিশ। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশের একেকটা দল মোতায়েন করা হয়েছে। ডাইনে বাঁয়ে যেখানে দৃষ্টি যায় সেখানেই পুলিশ। লোহার টুপি পরা পুলিশদের হাতে গুলী ভরতি রাইফেল, কোমরে টিয়ার গ্যাসের বাক্স অথবা মোটা প্যান্টের সংগে আটকানো কার্তুজ ভরা ছোট ছোট থলি। য়্যুনিভার্সিটি গেটের সামনে পুলিশ ব্যারিকেড। অপরদিকে অগুনতি কালো মাথায় ঠাসা য়্যুনিভার্সিটির মাঠটাকে মনে হয় মৌচাকের মতো।

তুমুল বাক-বিতণ্ডা হৈ-হল্লোড়ের শেষে দশজন দশজন করে একশো চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করবার অনড় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হলো। কয়েক হাজার কণ্ঠের ঘন ঘন শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। সারা শহরটাই যেন কেঁপে উঠলো থরথর করে।

ঃ রাষ্ট্রভাষা—বাংলা চাই।

ঃ নাজিম-নুরুল—গদি ছাড়ো।

ঃ ভাষার উপরে হামলা করা—চলবে না।

তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতর দিয়ে দশজনের একেকটা গ্রুপ বেরিয়ে আসতে লাগলো। ইতিমধ্যেই দুটো পুলিশ ভ্যান চুয়াল্লিশ ধারা অমান্যকারীদের দুটো গ্রুপ নিয়ে চলে গ্যাছে লালবাগের দিকে। ভয়লেশহীন ক্রুরমুখো মানুষগুলো তড়পাতে থাকে যুদ্ধের ঘোড়ার মতো। ক্রমশই পিছনে ঠেলাঠেলি বাড়ে। যে করে হোক একটা গ্রুপে সামিল হবার জন্যে মানুষ হন্যে হয়ে উঠেছে।

কড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া করার মতো মৃদু কট কট আওয়াজ ওঠে কোথা থেকে। একসাথে যেন কতকগুলি বুদবুদ ফাটছে নিকটে কোথাও। শেষ গ্রুপের দু'জন ছাত্র হঠাৎ মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যায়। অব্যর্থ বুলেটে একজনের গোটা মাথাটাই উড়ে গেছে। চারিদিকে ছুটো-

পুটি পড়ে যায়, পুলিশরা চঞ্চল হয়ে মাথার টুপি ঠিক করে। আবার ট্রিগার টেপে। লাঠি পড়ে। টিয়ার গ্যাস ফাটে।

মুখ থুবড়ে পড়ে যায় আরো তিনজন। ব্যাপারটা এতক্ষণে কারো আর বুঝতে বাকি থাকে না। উত্তেজিত জনতা স্লোগান দিয়ে ছত্রভঙ্গ হতে থাকে। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে তারা গিয়ে থামে মধুর স্টলে, য়ুনিভার্সিটি বিল্ডিংয়ে, পুকুরঘাটের শান বাঁধানো সিঁড়ির তলায়, আম গাছের আড়ালে। গুলী চালানো সত্বেও এখান সেখান থেকে বিছিন্ন আওয়াজ ওঠে ঃ রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই। নাজিম-নুরুলের ফাঁসি চাই। খুনি জল্লাদের বিচার চাই, দমন নীতি চলবে না।

গুলীবিদ্ধ আহতদের রক্তাক্ত দেহ নিয়ে রিক্সাওয়ালারা ছুটে যায় হাসপাতালের দিকে, কারো আদেশ নির্দেশের অপেক্ষায় থাকেনা। রাইফেল হাতে লোহার টুপি পরা পুলিশের দল ঢুকে পড়ে য়্যুনিভার্সিটি মাঠে। আবার লাঠি চলে, টিয়ার গ্যাস ফাটে। ধোয়া ওঠে। গুলী চলে।

শেষবারের মতো গুলীবিদ্ধ একজনের কণ্ঠনালী ছিড়ে স্লোগান ওঠে —রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই।

গুলীবিদ্ধ টলটলায়মান পতনোন্মুখ দেহটাকে সজোরে একটা লাথি মেরে ঘৃণা বিকৃত মুখে সামনের দিকে এগিয়ে আসে লালমুখো সার্জেন্ট। আরেকটা শিকারের খোঁজে হাতে উদ্যত পিস্তল। গড়াতে গড়াতে দেহটা গিয়ে স্থির হয় রাস্তার পাশে ড্রেনের থকথকে কাদায়। একটা উদ্ধত ঘোষণা নিয়ে যায় চিরদিনের মতো।

গুলীবর্ষণ। লাঠিচার্জ। বেয়নেটের আক্রমণ। টিয়ার গ্যাস। বিদ্যুৎ বেগে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে সারা শহরে আর পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে। পুরুষরা লাফ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসে রাস্তায়, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সকলেই। খবরটা বিষমাখানো চাবুকের ঘা দেয় সকল মানুষের পৌরুষে। উগ্র আত্মাবমাননা বোধে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অসহ্য ঘৃণায় মেয়েরা ঘরের কাজ বন্ধ করে।

চোখের পলকে দোকানপাট বন্ধ হয়, দোকানী বেরিয়ে আসে। অফিসে কলম ছুঁড়ে দেয় মসিজীবী। বেরিয়ে আসে বেয়ারা আর কেরানী। খণ্ড মিছিলে মুহূর্তে সারা শহর আর আশেপাশের গ্রামাঞ্চল ছেয়ে যায়।

প্রস্তুতির নতুন আহবান জানিয়ে দেয়ালে দেয়ালে নতুন পোস্টার পড়ে, শহর তোলপাড় হতে থাকে।

মেয়েদের অন্তঃপুরে ঢেউ এসে আঘাত করে। উত্তেজনায় ছটফট করতে করতে মেয়েরা ঘরময় পায়চারী করে বেড়ায় ঘনঘন। অকারণে হঠাৎ জানালা খুলে দড়াম করে আবার তা বন্ধ করে দেয়।

গোলাগুলীর খবর শুনে নীহার খালা প্রথমটা আঁতকে উঠেছিলেন। তারপর তাঁর চিন্তার ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে গ্যাছে। দুর্বোধ্য সংকেতে চোখের পাতায় ক্রমাগত কি একটা মায়াবী স্বপ্ন কেবলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে। তিনি হাঁটছেন কি বসে আছেন, সে কথা বুঝবার মতো স্নায়বিক সবলতাও আর অবশিষ্ট নেই। হঠাৎ তার চোখের পলক পড়া বন্ধ হয়। যেন কোন ভূত দেখেছেন। সম্মুখে দণ্ডায়মান লোকের উপর তার চোখ দুটো স্থির হয়। অচেনা অজানা একটা কুৎসিত মুখ। চোয়ালের উঁচু হাড় দুটো মুখটাকে আরো ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। জমাট আলকাতরার মতো গায়ের রং। ময়লা কালো সুতোয় বাঁধা একটা চৌকোণ সীসার কবজ গলায় ঝুলছে। ঘামে ভেজা স্যাঁতসেঁতে মুখ, গায়ের ময়লা হলদে রঙের গেঞ্জিটাও ঘামে ভিজে শরীরের সঙ্গে লেপটে আছে। আঁতকে উঠে নীহার খালা দু'পা পিছিয়ে যান ঃ কে। কে তুমি।

ঃ আমি রিকসাওয়ালা মাছাব। মাটির দিকে চোখ রেখেই লোকটা বিড়বিড় করে জবাব দেয়। কথা বলেই লোকটা মাথা ঘুরিয়ে হঠাৎ দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় তীরের বেগে। পরক্ষণেই আবার ফিরে আসে ভারী পায়ে, নির্বাক নীচু মাথায়। পিছনে সমগোত্রীয় আরো তিনজন লোক। কালো, কুৎসিত ঘামে ভেজা। একটা রক্তাক্ত দেহ তারা ধরা-ধরি করে নিয়ে আসে অত্যন্ত সাবধানে। মৃতদেহটা মেঝের উপর শুইয়ে দিয়ে স্খলিত পদে লোকগুলি বেরিয়ে যায়। ধরা পড়ার ভয়ে কয়েকজন ভীরু লোক যেন পালিয়ে গেল আসন্ন কোন কিছুর খপপর থেকে।

মৃত দেহটার উপর একবার তাকাতে চেষ্টা করেন নীহার খালা। পরিপূর্ণভাবে দেখার আগেই হিমশীতল একটা তরবারির তীক্ষ্ণ মুখ যেন তার কলজে ভেদ করে পার হয়ে যায়। নীহার খালা হাহাকার করে ওঠেন।

ঃ আহ—হারে! আবু! আবু আমার!

দু'হাতে মৃত দেহটা আঁকড়ে ধরে টেনে তুলে আনেন বুকের উপর। চেপে ধরেন একবার সজোরে, আলগা করে আবার চেপে ধরন। নিজের প্রাণের গহবরে যেখানে উত্তাপ আছে আবুর ঠাণ্ডা মৃত দেহটাকে যেন সেখানে সেধিয়ে দিতে চান ঃ আবু! আবু! কথা বলিসনে! কেন? কেন? কেন রে? আমিতো রাগ করিনি!

প্রাণের সমস্ত উত্তাপ বুঝি চোখের পানিতে ভিজে গ্যাছে। তাই আবু সাড়া দেয় না, কথা বলে না।

মৃত মুখটাকে বারবার নীহার খালা তুলে ধরেন নিজের মুখের কাছে। অভিমান, অভিযোগ, দুরন্তপনা কোন কিছুর চিহ্নই আর নেই! রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখ জ্যোৎস্না প্লাবিত আকাশের একঘেয়ে পাণ্ডুরতা, বিষন্ন নীলের স্তিমিত আভা। থেকে থেকে নীহার খালা ডুকরে উঠেন ঃ আবু—আবু! আবু উ!

বুক ফাটানো আর্তনাদে তিনি মাথা কুটতে থাকেন। কিছুতেই তাঁর বিশ্বাস হয় না, অবাধ্যতায় আবু এতো অমানুষিক, এতো মৌন। তাই বারবার তিনি আবুকে কথা বলাতে চেষ্টা করেন, অনুযোগ করেন, মিনতি জানান ঃ আবু! আবু! কথা বল, বল, বল! আমি যে তোর খালা, নীহার খালা।

আবু বুকে মুখ গুঁজে নীহার খালা চিবুক ঘষতে থাকেন। এখনো তাঁর ধারণা ও তো বেঁচেই আছে। চিবুকের ঘর্ষণে তাই ওর স্পন্দন জাগাতে চেষ্টা করেন।

কোথা থেকে কতকগুলী ভারী বুটের আওয়াজ এসে মৃতদেহটার সামনে থেমে যায়। একটা লোহার যন্ত্রকে গতি পরিমিত করে চাবি দিয়ে ছেড়ে দিলে যেমন কোন নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে একেবারে থেমে যায়, তেমনি পাঁচজন পুলিশ নিয়ে একজন পুলিশ অফিসার এসে থামে। তারা কিছুকাল দাঁড়িয়ে থাকে অসহিষ্ণু পায়ের উপর। তাদের সময়জ্ঞান, কর্তব্যবোধ একের পর এক তলিয়ে যেতে থাকে তন্ময় সমুদ্রে নিমজ্জমান ভারী নুড়ির মতো। একটা রহস্যময় পদছন্দে দুলতে থাকে তাদের মন। পুলিশ অফিসার হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বেটনের আগা দিয়ে একজন কনষ্টবলকে খোঁচা দেয়। লোকটা টাল সামলে বুটে বুটে

ঠোকাঠুকি করে, রাইফেলটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে উঁচু করেই নামিয়ে নেয়। পুলিশ অফিসার কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে ইঙ্গিত করে।

কান্নার প্রচণ্ড বেগে নীহার খালার দেহটা তখনো আন্দোলিত হচ্ছিল আবুর দেহের উপর। পুলিশরা এপা ওপা করে অস্বস্তিতে। নালমারা বুটের মৃদু আওয়াজ ওঠে মেঝের উপর। নীহার খালা তখনো আর্তনাদ করে চলেছেন ঃ আবু! আ! কথা বল! বল—

প্রতিটি কথার সঙ্গে সঙ্গে যেন তার পাঁজরার হাড় মড়মড় করে ভেঙ্গে যাচ্ছে।

পুলিশ অফিসার বেটন উঁচিয়ে আপন মূর্তি পরিগ্রহ করে। ভাবালুতার প্রশ্রয় আর দেওয়া চলে না। সরকারী দায়িত্ব আরো মূল্যবান। তাই গর্জে উঠে পুলিশ অফিসার ঃ কেয়া দেখতা হ্যায়। লাশ ছিন লেও। ছিন লেও।

তখন তখনি পুলিশরা তবু লাশটার গায়ে হাত উঠাতে পারে না। বিশৃঙ্খলভাবে মেঝেময় নড়াচড়া করে। কি এক শ্রদ্ধাবোধে ওদের হাতগুলো অবশ হয়ে গিয়েছে।

মুখ বিকৃত করে পুলিশ অফিসার আবার হুঙ্কার ছাড়ে ঃ কেয়া দেখতা হ্যায় শালালোগ? লাশ ছিন লেও। এই ঘুসঘুস মাত করো।

কথাটা নীহার খালার কানে যেতেই তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে ওঠেন। চোখের পানি শুকিয়ে গিয়ে সেখানে দেখা দেয় চৈত্র দুপুরের খর দ্যুতি।

দু'জন পুলিশ এসে তাঁকে আটকে রাখে। ধরাধরি করে লাশ নিয়ে বেরিয়ে যায়। বুটের শব্দ ক্ষীণতর হতে থাকে। সাড়াশী বন্ধনের ভিতর থেকে নীহার খালা চীৎকার করতে থাকেন ঃ ছেড়ে দাও আমাকে। আমার আবুকে নিয়ো না। নিয়ো না আমার আবুকে।

ঃ না! না! না! বলছি নিয়ো না! নিয়ো না আমার আবুকে, নিয়ো না।

বাইরে বুটের শব্দ মিলিয়ে যেতেই পুলিশ দু'জন নীহার খালাকে ছেড়ে দেয়। নীহার খালা ছুটে যান তাদের পিছনে পিছনে। প্রার্থনা জানান বুক ফাটানো কান্নায় ঃ শোনো! ওকে নিয়ো না! পরে এসে না হয় নিয়ে যেও। ওযে আমার হাসি দেখতে চেয়েছিল! আমার হাসি!

নীহার খালার বিলাপ ছাপিয়ে পুলিশ ভ্যানের স্টার্টারটা গর্জে ওঠে। চলন্ত গাড়ীটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নীহার খালা হঠাৎ হেসে ওঠেন প্রচণ্ড অট্টহাসি। মধ্যরাতে ধ্বংসোন্মত্ত প্রেতিনীর অশরীরী হাসির মতো ভয়ঙ্কর, অসহ্য সুন্দর ঃ হাঃ। হাঃ! হাঃ। হাঃ। সহসা হাসির গমক থাকে ঃ আবু। আবু। দেখে যা আমি হাসছি। তুই যে দেখতে চেয়েছিলি, দেখে যা। দেখে যা।

আবার তিনি হেসে ওঠেন ঃ হাঃ। হাঃ। হাঃ। হিঃ। হিঃ। হি-।

সেই থেকেই নীহার খালা হেসে চলেছেন। সকাল, সন্ধ্যায়, দুপুরে, মধ্যরাত্রিতে। যখনি আবুর কথা মনে হয় তখনি তিনি হাসেন।

সে হাসি কখনো থামবে না।

প্রথম বধ্যভূমি

রাবেয়া খাতুন

আজকাল প্রায়ই লাল টকটকে চোখ নিয়ে বাড়ী ফিরতো শাহেদ। ক্লান্ত শরীর নিয়েও। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে আবার বেরুতো। রাত জেগে পোস্টার লেখা, সেগুলো লাগানোর ব্যবস্থা করা। কাজের নাকি শেষ নেই। কথাগুলো কবে কখন বলেছিলো শাহেদ? মনে করতে চেষ্টা করে আকাশের দিকে তাকালেন সাবের সাহেব।

ফ্যাকাশে নীল আকাশে চক্র দিয়ে বেড়াচ্ছে যে পাখীগুলো, পায়রা মনে হয়েছিলো প্রথম দৃষ্টিতে। ভুল ভাঙ্গলো কয়েক মিনিটের ভেতর।

উত্তেজিত পায়চারী করতে করতে থেমে দাঁড়ালেন সাবের সাহেব। পায়রা কোথায়? সূর্যের কম আলো আর ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে আসা চোখের চাউনি দায়ী এই ভ্রান্তির জন্য।

হাওয়ায় পাতা উল্টে যাওয়া খোলের বইটার দিকে তাকালেন। দূরমনা হয়ে গেলেন। ইতিহাস কথা বলে না। কিন্তু পুনরাবৃত্তি ঘটায়। যুগ থেকে যুগে। এর মধ্যে আবার এক একটা সময় আসে নিদারুণ অস্থিরতা, অনিশ্চয়তার আধি নিয়ে। সিরাজদ্দৌলা থেকে বাহাদুর শাহ। কোম্পানীর আমল থেকে মহারানীর যুগ। প্রায় দুশো বছর পরাধীন একটি জাতির জন্য নানা দুর্দিনের, অপমানের—

ওমা মাগো দেখো এসে কতো লম্বা মিছিল।

তোরাই দেখ বাপু চুলায় আমার রান্না।

রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছিলো ভুনা পোলার চালের ঝাঁজ মিষ্টি গন্ধ। খিচুড়ীতে গরম পানি ঢেলে জলির কথার জবাব সেরে আয়শা বানু স্বামীর উদ্দেশ্যে বল্লো, তুমি কি ঐ ইজি চেয়ারে বসেই দিনটা পার করবে নাকি?

কাজ কিছু থাকে তো বলো?

গোসল করতে হবে না। বেলা কতো গড়ালো খেয়াল আছে।

উম্।

শব্দটা সুখের। কিন্তু ওঠার কোনও গরজ দেখালেন না। আসলে জমে আছে সারা শরীর; জাগতিক সমগ্র চৈতন্য। কি করে, কেমন করে বললেন কথাটা। অথচ বলতে হবেই।

বাবা, বাবা, রাস্তার লোকজন সব দৌড়াচ্ছে।

দৌড়াচ্ছে নয়, পালাচ্ছে।

জলি, শেলীর কথার মধ্যে বিরক্তি প্রকাশ করলেন আয়শা বানু—ঐ এক নতুন রোগে ধরেছে তোদের। রাস্তার মানুষ দৌড়াচ্ছে কি পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে তাতে তোদের কি বাপু। যা না গোসল সেরে আয় চটপট।

মায়ের ধমক খেয়েও কুয়োতলার দিকে নড়লোনা ওরা দুজন। বরং বারান্দার মীচে দাঁড়িয়ে বল্লো, চলোনা বাবা বাইরে গিয়ে দেখি আসি কি হচ্ছে। আমাদের ক্লাশের মনিটর বলছিলো আজ নাকি গণ্ডগোল হতে পারে। বেশী দূরে তো যাবোনা, এই গলির মুখে।

স্বামী কিছু বলার আগে চুলার ধার থেকে আয়শা বানু বল্লেন, খবরদার এক পা বাড়িয়েছিস তো টেংরি ভাংবো। বেশী দূর নয় গলির মুখ! একজন তো এই কথা বলে বেরিয়েছে সেই কোন্‌কালে। ফেরবার নামটি নেই এখনো। হা গো শাহেদ ফিরবে কখন? কিছু বলে গেছে।?

এসে যাবে। জবাব দিয়ে আবার দূরমনা হয়েগেলেন সাবের সাহেব। চোখের ওপর আজ সকালটা। ঘুম ভেঙেছিলো আজানের শব্দে নয়, পাখীর স্বরেও নয় বহুকণ্ঠের শ্লোগানে—রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই—

আজকাল প্রায়ই হচ্ছে এমন। সময়ে অসময়ে। দেশ দুভাগ হয়নি স্বাধীনও হয়েছে। নতুন ভূখণ্ডের নাম হয়েছে পাকিস্তান। কিছুদিন আগেও ওরা প্রতিষ্ঠা দিবস চৌদ্দই আগষ্ট উৎসাহের সঙ্গে পালন করেছে। জাতিরজনক কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে দেখার জন্য ধারন করেছে আগ্রহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ময়দানী জনসভায় বক্তৃতারত মানুষটিকে দেখা অবাক হয়েছে। কাঠ কাঠ শরীর। রোগা রোগা মুখ। এই লোকটি নেতৃত্ব দিয়েছেন হাজার হাজার মানুষের। মুগ্ধ নিবিড় আবেশ কাটলো বিদ্যুৎ ভূমিকম্পে। জিন্নাহ প্রথমবারের মতে

এদেশে এসেই বল্লেন. রাষ্ট্র ভাষা উর্দ্দু হবে। দেশের বৃহৎ জনসংখ্যা যেখানে বাংলায় কথা বলছে, সেখানে অন্য ভাষা প্রাধান্য পায় কি করে? চারদিকে উঠলো রকমারী গুঞ্জন।

ওটা যে ওদের মাতৃভাষা।

পাকিস্তান হবার জন্য নানাভাবে যুদ্ধ করলাম আমরা সবাই। আর যেই পাকিস্তান হলো, উনি মনে করে নিলেন এটা তার পৈতৃক সম্পত্তি। নইলে জনমতের তোয়াক্কা না করে এমন কথা বলেন কি করে? প্রকাশ্য ঘোষণার সাহস পান কোথায়?

শাহেদরা বলতো, এটা মানা যায় না। আমরা হাফপ্যান্ট পরা অবস্থায় স্কুলে পিকেটিং করেছি, ফুলপ্যান্ট পরা অবস্থায় প্রতিবাদ করবো।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ জাতির জনক খেতাব পেয়েছিলেন, কিন্তু পিতার দায়িত্ব পালনের উদার নীতি অবলম্বন করেননি। পল্টনের খোলা ময়দানে বক্তৃতা দিয়ে উড়ে গেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখান থেকে আরও দূরে—মৃত্যুর খেয়ায়। কিন্তু যে ঢেউ ফাঁকা মাঠে তুলে গেছিলেন কটা বছরের ভেতর রাজপথ থেকে পথে, পথ থেকে গলিতে ছুটোছুটি করতে লাগলো অস্থির প্রতিবাদী গতিতে। বিপরীত দিক থেকে আসছিলো মারাত্মক হুম্‌কি। তবু প্রবহমান রয়েছে আন্দোলন।

সকালে আয়শা বানু ছেলেকে বেরুতে দেখে বলেছিলেন, কাজ নেই শাহেদ আজ তোর বাইরে গিয়ে।

শাহেদ পাঞ্জাবীর বোতাম লাগাতে লাগাতে বলেছিলো, কলেজে যাচ্ছি মা, বাইরে নয়।

উম্ যেনো ঐ গণ্ডির ভেতর দাঁড়িয়ে থাকবার ছেলে তুই।

জবাব না দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেছিলো শাহেদ। আয়শা বানু তাকিয়েছিলেন স্বামীর দিকে ভুরুজোড়া খাড়া করে—তুমি যে বল্লেনা কিছু?

কি বলবো? ছেলে তোমার বড়ো হয়েছে। ভালোমন্দ বুঝতে শিখেছে। এখন বাধাই বা কেন দেবে। আর দিলেইবা সে কেন মানবে?

মানবেনা মানে? মাথার ওপর তবে বাপ মা থাকে কেন? যদি খেয়াল খুশী মতোই চলবে তো—

স্ত্রীর কথার ভেতর কথা গুজলেন সাবের সাহেব। বল্লেন, আহা খেয়াল খুশী বলছো কেন। আজ কি ও একা বাইরে যাচ্ছে। ওর মতো হাজারো যুবক—

থামলেন হঠাৎ। স্বর, দৃষ্টি, মুখের রেখা বদলে নিয়ে আবার বল্লেন, থাক ওসব কথা।

আয়শা বানু বল্লেন, কিন্তু এটা মনে রেখো ছেলে যদি মাথায় ইট পাটকেল বা হাতে রাইফেলের গুতো নিয়ে বাড়ী ফেরে, তোমার সঙ্গে আমার লণ্ডভণ্ড কাণ্ড হয়ে যাবে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে পেছনে রেখে গেলেন আরও কিছু কথা—ছেলেটা কদিন থেকে ভুনা খিচুড়ী খেতে চাইছে। তা এমন একটা কোমরভাঙ্গা স্কুলে চাকরী করো, যেটার আরগুণ নেই কিন্তু চারগুণ ঠিকই আছে। এদিকে বড়োবড়ো লেকচার, ওদিকে মাইনে দেবার বেলা রাজ্যির অনিয়ম। কাল টাকা পেলে, তড়িঘড়ি আজ যাও-বা ভালো খাবারের যোগাড় করলাম তো ছেলে চল্‌লো মিছিল করতে। এখন অবেলায় এসে খাক ঠাণ্ডা বিস্বাদ খিচুড়ী। তোমার কি।

শুনে খানিকটা হাসির মতোই কিছু ফুটেছিলো ঠোঁটের ভাঁজে। এখন তো শাহেদের পা দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে গিয়ে পৌঁছেছে। সাত চল্লিশের আগে একদিন স্কুলে গিয়ে প্রধান ফটকে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছিলেন শাহেদকে। কতোই বা বয়েস তখন? প্রথমে চমকে উঠেছিলেন। শহরের স্কুলে স্কুলে পিকেটিং-এর ধুম। কিন্তু তার মধ্যে ছেলে থাকবে? বাড়ী ফিরে স্ত্রীর কাছে বলেছিলেন, তোমার ছেলের জন্য এবার যাবে চাকরীটা। ষষ্ঠ জর্জের আমলারা আর যাই সহ্য করুক, স্কুল মাস্টারের ছেলের বাড়াবাড়ি সহ্য করবে না।

ছেলেকে প্রথম দিকে তিনি শাসাতেন। যে রাজার রাজ্যে সূর্যাস্ত যায় না, এইসব নিরামিষ অসহযোগ আন্দোলন করে তাড়ানো যাবে তাদের, মাঝখানে নগদ লাভ জুটবে নানা গঞ্জনা।

শাহেদ খুব একটা কানে তুলতো না। কখনো বলতো, এখন আমরা ছাত্ররা মিছিলে যাচ্ছি, তোমরা মাস্টাররা বাধা দিচ্ছো। এমন একটা সময়ও আসতে পারে যখন তোমরাও মিছিল করে রাস্তায় নেমে আসবে নিজেদেরই প্রয়োজনে।

এরপর ছেলেকে খুব একটা ঘাটাতেন না। এ পোড়া দেশে শিক্ষকদের অভিযোগ চিরকালই আছে। কিন্তু তা নিয়ে রাস্তাঘাটে নামার কথা ভাবা যায় না। যেমন ভাবা যায়নি ইংরেজ রাজতন্ত্র খতম হবার ব্যাপারটা।

সাতচল্লিশে তারা যখন সত্যি সত্যি চলে গেলো, আপন সন্তানের ওপর একধরণের বিশ্বাস এলো। তাই স্ত্রী যখন শাহেদের মিছিল, স্লোগান ইত্যাদি নিয়ে চেঁচামেচি করেন, তিনি শুধু বলেন, ভালোভাবে ফিরে আসিস।

আজ সকালেও বলেছেন। কিন্তু---

বাবা, বাবা কাদের বাড়ীতে যেনো আগুণ লেগেছে।

জঙ্গি-লীগের জোর চিৎকারে সজাগ হলেন। এই চৈত্রমাসে আগুন। শুকিয়ে সব খটখটে হয়ে আছে না। লাগলো কোন্ দিকে? উঠে দাঁড়ালেন। কুণ্ডলি পাকানো কালো ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। দিক ঠাহর করা যাচ্ছে না। মূল শহর থেকে থাকেন অনেকটা দূরে। নগর প্রাণের স্পন্দন কখন কত ত্রিগ্রী চড়লো ধরা যায় না ঠিক মতো। তবে এটা সত্যি গত কিছুদিন থেকে মাথার ওপর অভাবিত কোনও ঝড়ের আশংকা নিয়ে থমথম করছে গোটা ঢাকা শহর। এ প্রেক্ষাপট তার চোখে চেনা নয়। সিপাহী বিদ্রোহের বিপ্লবীদের আষ্টাঘরের ময়দানে প্রকাশ্য ফাঁসীর কথা তিনি শুনেছেন। কিন্তু দেখেছেন পরবর্তী সময়ে স্বদেশীরা কোর্টে চালান হলে তাদের এক পলক দেখার জন্য আদালত প্রাঙ্গণে জনারণ্যের উত্তাল ধারা। কলিজা কাঁপানো দাঙ্গা দেখেছেন কয়েকবার। দেখেছেন দিনের পর দিন দমবন্ধ করা কারফিউ। পাকিস্তান হবার পর স্বাধীনতা লাভের উৎসব মুখর রাজপথ। এই রাজপথে আবার আর কিছু দেখতে হবে, তাওমাত্র পাঁচ ছ'বছরের ভেতর, একেবারে ভাবতে পারেননি। বত্রিশের ঢাকাকে, বায়ান্নর ঢাকাকে কখনো মনে হচ্ছে মশাল নগর, কখনো শোকাচ্ছন্ন সমাধি শহর---

সমাধি শহর? চমকে উঠলেন? আজ থেকে মনে হবে শোকাচ্ছন্ন সমাধি শহর। ওরা ছাত্র-জনতার গায়ে গুলী ছুড়েছে। সরকারী ১৪৪ ধারা অমান্য করে যে মিছিলটি এগুচ্ছিলো অস্থায়ী সংসদ ভবনের দিকে, সেখানে চলছে তখন বাজেট অধিবেশন। ছাত্র-জনতার স্রোত মেডিকেল কলেজ ছাত্র নিবাসের কাছে পৌঁছামাত্র ছুটে এলো ঝাঁকঝাঁক গুলী।

বাঙ্গালী মন্ত্রীর হুকুম পালিত হয়েছে পাঞ্জাবী চীফ সেক্রেটারীর তত্ত্বাবধানে। ঘটনাটা যেনো বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু বুলেটে ছিন্নভিন্ন হয়েছে মানুষের শরীর; সেই সঙ্গে ছিটেছান হয়েছে স্বাধীনতা নামের দেশের লোকের আস্থা ও বিশ্বাস নামক সমুদয় হৃদয়বৃত্তির।

কিন্তু স্ত্রীর কাছে কি জবাব দেবেন তিনি। বারান্দা থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন পরম নিশ্চিন্তে বটিতে সালাদের ব্যাঞ্জন কাটছে আয়শা বানু। শাহেদ খিচুড়ীর সঙ্গে খেতে পছন্দ করে। ঠিক্যা-ঝিকে শ্রোতা বানিয়ে যেসব কথা বলছেন তাও কানে আসছে—বুঝলে চিনিরমা, মায়ের দুঃখ ছেলেমেয়েরা তলিয়ে দেখতে চায় না। আজও শুনেছিলাম কলেজ হবে না।

হইবোনা ক্যান আম্মা।

ছেলেরা করবে না। তাই বল্লাম যা শাহেদ একবার মুন্সীগঞ্জ গিয়ে দুলিকে দেখে আয়। বুঝলে গো আদর করে পয়লা সন্তানের নাম রেখেছিলাম দুলারী। তো কপাল দোষে পড়েছে এমন সব মানুষের ঘরে, ওর প্রতি চিঠিতেই আমার চোখের পানি ঝরে।

ক্যানগো আম্মা, আমগোর মাইয়াগোর মতন আপনেগো ভদ্দর-লুকের মাইয়াগোও জ্বালান পোড়ান অয় নিহি পরের ঘরে?

তা আর হয়না। মেয়েটা আমার যেমন মাটির মতো, শাউড়ী মাগী তেমনি আগুনের মতো। হাড়হাড্ডি চিবিয়ে কিছু রাখলো না। তো শাহেদকে সেই কবে থেকে বলছি, নিয়ে আয়। কটাদিন দুলি নাইঅর থেকে পরান ঠাণ্ডা করে যাক। আজ যাই, কাল যাই করে ছেলের আমার যাবারই সময় হচ্ছে না।

কলেজবাবু হইছে যে আম্মা।

তাই বলে আর কিছু বুঝবে না। বুঝবে না ওছাড়া আমার কি আরও একটা ছেলে আছে যে তাকে পাঠাবো? থাকার মধ্যে রোগা পটকা ঐ মানুষটা। অসুস্থ শরীর নিয়ে সে ইস্কুল করবে না নদীর ওপাড় যাবে।

ওরা হয়তো আরও কিছুক্ষণ এমনি কথা বলে যাবে। এক সময় হয়তো আয়শা বানু এমন মন্তব্যও রাখবে, মেয়েটাকে তেমন দিতে থুতে পারেনি বলেই শাশুড়ী জ্বালায় বেশী। ওরা মাস্টারের মেয়ে যেমন চেয়েছে, তেমনি চেয়েছে নিজেদের ছেলের সাধের দু'চারটা সামগ্রী।

এ জীবনে স্বামী যা পারেনি তার মেধাবী পুত্র বড়ো চাকরী করে তা পারবে। সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর বাড়ীতে বেড়ে যাবে দুলারীর দাম।

কিন্তু যার জন্য সে এখন কোথায়? কেমন করে তিনি বলবেন 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা হোক'—এর আন্দোলনে যোগ দিতে গিয়ে পুলিশের নির্মম গুলিতে নিহত হয়েছে তাদের একমাত্র পুত্র সন্তান।

আয়শা বানু হয়তো কান্নার আগে প্রশ্ন করে বসবে, মাতৃভাষার জন্য মানুষ জীবন দেয় এ আবার কেমনতর কথা।

ছোট্ট এই প্রশ্নটি তার দিকে ছুটে এলে কি জবাব দেবেন জানা নেই। বুদ্ধিতে নেই। সকালে যে বেরিয়ে গেছে যুবকের সঙ্গে, সন্ধ্যায় সেই দল হয়তো ফিরে আসবে। তাদের ভেতর নিজের ছেলেকে না দেখে স্ত্রী আর কারু নয় তার দিকেই তাকাবে। আর্তস্বরে তুলবে চিৎকার—ওগো সবাই ফিরে এলো, এলোনা শুধু সে। কেন, কেন?

বলি আজ তোমার হয়েছে কি?

সজাগ হলেন। সামনে দাঁড়িয়ে আয়শা বানু—খাবে না?

খাবো?

ওমা, যেন নতুন শুনলে শব্দটা।

তা নয়।

তবে কি ভাবছো শাহেদ ফিরলে একসঙ্গে বসবে। আমিও তো তাই ভেবে বেলা কম বাড়ালাম না। কিন্তু দিন ছোটো। তার ওপর তোমার ঐ শরীর। অবেলার খাওয়া একেবারে সহ্য হবে না। তাছাড়া জলি-নেলির কথা ভাবো। ওদের খুব খিদে পেয়েছে। কখন থেকে খ্যানখ্যান করছে খাবার জন্য।

ঠিক আছে, চলো বসছি। আজ আর গোসল করবো না।

সাবের সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

আয়শা বানু খাবার পরিবেশনের এক ফাঁকে সাহেবের ঘরে গিয়ে ঠিক করে রেখে এলেন চটি জোড়া। পাশে চারখানার লুঙ্গিটা। না জানি কতো খিদে পেটে ফিরবে। যাবার সময় তাড়াহুড়োর মধ্যে নাস্তা পর্যন্ত খেয়ে যেতে পারেনি। অভিযোগ করেছিলেন বলে এক ঝলকের জন্য থেমে গিয়ে শাহেদ বলেছিলো, দেরী করবো না। খিচুড়ী রাঁধবে বলছো, ওটা হতে না হতে দেখবে এসে গেছি। নাস্তার ক্ষতিপূরণটা তখনি করে নেবো।

লুঙ্গির পাশে গামছা রেখে ফিরে এসে দেখলেন স্বামী হাত ধুচ্ছেন। তাকালেন একটু অবাক চোখে। শাহেদের মতো ওর বাপও যে খিচুড়ী খুবই পছন্দ করে। ভয় পেয়ে বল্লেন, কিগো শরীর খারাপ লাগছে?

না। তুমি খেয়ে নাও। আমি একটু গলির দিকটা ঘুরে আসি।

স্ত্রীর হাত থেকে পান নিতে ভুলে গেলেন। আয়শা বানু এগিয়ে এসে খিলিটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বল্লেন, বাপ ব্যাটা সমান মন ভুলো হয়েছো। দেখা হওয়া মাত্র আজ একটু বকবে কিন্তু। কেমনতর আক্কেল। এতো বেলাতেও ঘরে ফিরছে না। আমি দুশ্চিন্তায় থাকি না। ছাত্ররা আজকাল লাঠিসোটার বাড়ি খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকলে পুলিশ নাকি আরও বেশী করে মারে। ভাবতেও কলজের পানি শুকিয়ে যায়গো।

লম্বা নিঃশ্বাস লুকোলেন সাবের সাহেব। এর বেশী আয়শা বানু ভাবতে পারে না। আজকালকার মা বলে এটুকুও স্পষ্টভাবে বলতে পারছে। স্ত্রীর উদ্দেশ্যে মনে মনে বল্লেন, হে বিদ্রোহী সন্তানের জননী তোমার আরও স্পষ্ট শক্ত হতে হবে। সামনে বড়ো দুঃসময়। হয়তো আজ সূর্যাস্তের আগেই তোমাকে মুখোমুখী হতে হবে সেই সময়ের। তুমি তৈরী হও।

গলির মুখে ছড়ানো ছড়ানো পাড়ারই কিছু মানুষ। ভীত, আতংকিত। ভেতরেই চলাচল করছে ছেড়াছেড়া সংলাপ—পুলিশ কিছু লাশ একদম গুম করে দিয়েছে—কিছু লাশ নিয়ে দু'দলের মধ্যে অসম যুদ্ধ হয়েছে—আগ্নেয়াস্ত্র, আর্তনাদ, ধোঁয়া, গর্জন, সব কিছুর শেষে জায়গাটাকে মনে হচ্ছে বিরান বধ্যভূমি-------

চাচাজান?

কে?

চমকে তাকালেন। শাহেদের বন্ধু আলমগীর। গলার কাছটা দলা পাকানো। ভাষা উঠে আসতে চাইছেনা। নিজের ওপর অসম্ভব জোর খাটিয়ে তবু বল্লেন, লাশ পেলে?

জিনা। ওরা শুধু প্রাণে মারেনি। দেহ কটাকেও কেড়ে নিয়ে গেছে। শাহেদ শেষ নিঃশ্বাস নিয়েছিলো আমার কোলেই। সান্টু আহত হলো তখনি। ওকে রেখে সান্টুর কাছে যাবো, শুরু হলো টিয়ার গ্যাসের ঝড়। তার ভেতর---

আলমগীর মুখ নামিয়ে নিলো। কয়েক পলক, আবার সরাসরি তাকিয়ে বল্লো, ওরা ভেবেছে ডাণ্ডা ঘুরিয়ে জিতে গেছে। এটা কি যুদ্ধ যে হারজিৎ থাকবে। এটা একটি জাতির নিজস্ব আত্মীক দাবী। যতোক্ষণ সে দাবী না মিটবে আগুন জ্বলবেই। আপনি কি আমাদের সঙ্গে আসবেন?

কোথায়?

গায়েবানা জানাজায়।

যাবো। কিন্তু তার আগে তোমার চাচীকে---থেমে প্রায় স্বভাব বিরুদ্ধ ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠলেন, তাকে আর কতোক্ষণ অন্ধকারে রাখবো? সান্টু এসেছে আমার সঙ্গে। সে বাড়ীর ভেতর গেছে চাচীকে সব কথা জানাতে।

আমরাও সব জেনেছি সাবের সাহেব। মৃত্যুকে তো থামানো যায় না, সময় মতো সে আসবেই। তবে আজ বৃহস্পতিবার। বড়ো ভালো দিনে গ্যাছে আপনার ছেলেটা। গোর আজাব একদম মাপ।

প্রতিবেশী শমসের আলীকে যেনো তার জবাবে আবার বলছে, থামুন মিয়া ভাই। লাশই গায়েব আর আপনি করছেন গোর আজাবের চিন্তা ভাবনা।

সাবের সাহেবের কানে কিছু ঢুকছিলো না। আলমগীরের কথা শেষ হতেই তিনি রওনা দিয়েছিলেন বাড়ীর দিকে। এখন তিনি পুত্র শোকভারাক্রান্ত পিতা নন। সন্তানহারা জননীর স্বামীও। আচমকা ঘুরে দাঁড়ালেন—সানু ছাড়া তোমার চাচীর কাছে আর কে আছে?

পাড়ার অনেক মহিলা এসেছেন দেখলাম।

তবে চলো। শাহেদ নয় একজন শহীদ, না না অনেক শহীদের জানাজায় শরীক হতে যাবো আমি।

পরের লাইনটা ভাঙ্গা জমে যাওয়া গলায় উচ্চারণ করলেন সাবের সাহেব—আর যাবো স্বাধীন দেশের সেই বধ্যভূমিটা দেখতে, যে দেশের জন্য দুশো বছর আমরা নানাভাবে সংগ্রাম করেছি।

বড়ো রাস্তায় লাল পাগড়ির ধকল। অন্ধকারেও তারা চোখ জ্বালিয়ে রেখেছে বনবেড়ালের মতো। যেতে হবে গলি, কানাগলি, গেরস্থঘরের আঙ্গিনা দিয়ে।

ঘোরের মধ্যে এক সময় এসে পৌঁছুলেন পলাশী ব্যারাকে। একটি বাড়ীর দেয়ালের দুদিকে দুটি মই লাগানো। তা টপকালে মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের অস্থায়ী আস্তানায় পৌঁছে যাওয়া যায়।

খোলা উঠোনের মাঝখানে কিছু ছেলে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। মই পেরুতে কষ্ট হয়েছে সাবের সাহেবের। এখন ধ্বক্ করে উঠলো বুক, আবার নতুন লাশ পড়েছে? না কি পাওয়া গেছে শাহেদকে?

কাছাকাছি এসে দেখলেন সবছেলে দাঁড়ানো নয়। কিছু বসেও। ভাংগা কাচ, বুলেটের খোল, টুকরো ইট, খণ্ড কাঠের বিক্ষিপ্ত ক্ষেত্রভূমিতে বসে, হাতে হাতে তারা তৈরী করছে চৌকোণ একটা কিছু। সেটা কি প্রশ্নের আগেই অনেকগুলো বুটের শব্দে চমকে উঠলো চারদিক। অস্ত্র-ধারী, বিশেষ পোশাকে ঢাকা একদল মানুষ। ক্ষ্যাপা হাতে তারা ভাঙ্গছে কৌণিক সেই স্তম্ভটা। বেয়নেটের খোঁচায়, বুটের ধাককায় সেটা মাটির সঙ্গে সমান করে দিয়ে চলে গেলো বীর ভঙ্গিতে। কে একটি তরুণ বল্লো, এই নিয়ে তিন বার হলো।

সঙ্গে সঙ্গে বাজলো অন্য একটি কণ্ঠ—কতোবার ভাঙ্গবে? কতোরাত জাগবে ওরা? ওরা হুকুম তামিলের ক্রীতদাস। আর আমাদের পাঁজরে ভাই হারানোর কান্না। ভাঙ্গা গড়ার খেলায় কতোক্ষণ টিকে থাকবে ওরা। বন্ধুরা---

আধোআধো আলোর ধোঁয়াটে অলৌকিক জমির কোথথেকে যেনো ছায়ার মতো এগুতে থাকলো কারা। কারু হাতে তেজাবালি, কারু ইস্পাতের কণি, কারুবা ইটের চাঁই।

অবারিত আকাশের তলায় আবার বসে গ্যালো একদল স্থপতি। আনাড়ী কিন্তু আন্তরিকতায় উষ্ণ অস্থির হাত।

লম্বা টিনশেডের বারান্দার একটা খুঁটির কাছে বিহবল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সাবের সাহেব। আলমগীর কাছে এসে আস্তে আস্তে বল্লো, ওরা রাজপথের রক্ত অগ্রাহ্য করে, মৃতদেহ গুম করে আমাদের অস্বীকার করতে চাইছে। আমরা তা দেবো না। ভাই-এর মৃত্যুকে আমরা অমর করে রাখবো ঐ মিনার শহীদ মিনার তৈরী করে।

বধ্যভূমি দেখতে এসে এ তিনি কি দেখছেন? সাবের সাহেব খুঁটিটা দুহাতে আঁকড়ে ধরলেন। রাত কতো কে জানে? তবু এই যুবকদের সঙ্গে এখানেই তিনি জেগে থাকবেন।

অগ্নিবাক

আতোয়ার রহমান

মা

মনটা যেন নিজের ব্যথার ভারে নিজেই আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কান্না আপনা ক্লান্তিতে যতি দিয়েছে আবার পূর্ণোদ্যমে নামবার জন্যে। যেন বর্ষণ-ক্লান্ত শ্রাবণের আকাশ নিজেরই বুক আর চোখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। আকাশের রঙ এখন ইঁদুরের গায়ের মত ধূসর। যতির আলোকে আকাশ আবার বর্ষণ-অন্ধকার-মুক্ত পৃথিবীকে দেখতে পায়।

মণি আবার বাস্তব হয়ে ওঠে। মুখখানায় অপার তৃপ্তির আভাস, যেন মেহনতী বুভুক্ষুর ভাগ্যে ভর-পেট আহার জুটেছে। কিন্তু এ-তৃপ্তি নতুন নয়, ওর বয়সেরই মতন প্রাচীন, পূর্ণ একুশ বছরের, একান্তই নাছোড়। ওর ওই তৃপ্তির আড়ালে দুর্মর এক চঞ্চল পিপাসা আত্মগোপন করে থাকে। সময় পেলেই সেই পিপাসা বেরিয়ে পড়ে উদগ্র হয়ে।

তিন বছর আগের কথাও নয়। ওরা তখন সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার জ্বালার দহন থেকে—মানুষের দহন থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য পাকিস্তানে আশ্রয় নেয়। উলুবেড়ে থেকে বেরোবার আগে মণি বললো, মা, জীবনে আর কিছু চাইনে। শুধু একবার এখান থেকে চলো।

দুঃখের মধ্যেও মা অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন, তোমার মত খঞ্জনীর-লেজ ছেলে এতো অল্পেই শান্ত হবে?

বিশ্বাস করো মা। ঢাকায় পৌঁছে অষ্টপ্রহর যদি তোমার কোলে বসে না থাকি তো আমি .....

মা হাসলেন।

কিন্তু ঢাকায় এসে চোখ মুছলেন। ছেলে দু'দণ্ড ঘরে দাঁড়ায় না। কোনোক্রমে চারটি ভাত মুখে দিয়ে পথে গিয়ে কুলি ফেলে। তারপর খালি হৈ চৈ, রৈ রৈ, ক্লাব-লাইব্রেরী, সভা-সমিতি, আরো কতো কি।

মা তার শুকনো মুখের দিকে চেয়ে বললেন: হাঁরে, জীবনের ওপর কি তোর একটুও মায়া নেই? সারাটা দিন তো অমন করে বেড়াস।

মণি হাসে, মায়া আছে বলেই তো অমন করি। মরতে তো আর চাইনে। পৃথিবীটা কত সুন্দর, দেখো তো। তাছাড়া, নতুন জায়গায় এসেছি, ঘুরেফিরে সব জেনে নেব না?

তারপর একটুখানি থেমে গলাটা ভারী করে বলেঃ জানো মা, গরীবের অবস্থা সব জায়গায়ই সমান। মোহাজেরদের উলুবেড়েতে যেমন দেখেছি, এখানেও তেমনি। বড়োলোকেরা নিজেদের স্বার্থ বাঁচাবার জন্যে দাঙ্গা বাধিয়ে আমাদের ভোগান। আর কত কি করবে, কে জানে।

কলেজে ঢুকে মণি কি সব নতুন কথা বলতে শিখেছে। কিছুটা বিস্ময়ে, কিছুটা ভয়ে, কিছুটা আনন্দে মা চুপ করে থাকেন। সব কথা তিনি বোঝেন না। দারিদ্র্যের সূত্র ধরে বলেন, গরীব শুধু বাইরেই দেখিস। ঘরে দেখিসনে।

ঃ দেখিই তো। তাই বলে কি আমায় রাজা হতে হবে, মা? ওতে আমার সাধ নেই।

ঃ শোনো ছেলের কথা। রাজা হতে কে বলেছে। দশজনে যেমন চলে, তুইও তেমনি চলবি।

দশজন। ঠিক বলেছো। তা না হলে তুমি আমার মা? মণি মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে নাচতে থাকে।

মায়ের ভাবনা মেটে না।

টানাটানির সংসার। শুধু আজকে নয়, জন্মাবধি। উলুবেড়েতে মণির বাবা ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির কেরানী। নামেমাত্র একটা ভদ্রাসন ছিলো শহরের একান্তে। সম্পত্তির মধ্যে ওইটুকুই। হাতের পাঁচ গয়নাগাটি যুদ্ধের আমলেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো। মা, বাবা, মণি, মিনা আর রেবী, পাঁচটি মানুষের খরচান্তিক সংসারের দিকে চেয়ে বাবা তখন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণায় থমকে যাওয়া কঙ্কালসার মানুষ তিনি। তাঁর নিঃশ্বাস শুনে মা চমকে উঠে বলেছিলেন, এতোও ছিলো আমাদের বরাতে।

বাবা সামলে নিয়েছিলেন তক্ষুণি ঃ নাহ, কি আবার থাকবে বরাতে। তারপর পাঠরত মণির দিকে চেয়ে বলেছিলেন, কোন ভয় নেই আমার। মণি আছে যে ....

মণি আছে। বছরের পর বছর ওর বয়েস বেড়েছে, আর এই কথা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতরো করে শুনেছে ও। ক্রমবোধ্য কোনো কথার মতো তার অর্থটাও ক্রমশঃ গভীর এবং ব্যাপক হয়ে উঠেছে ওর মনে। বোধ হয় সে জন্যেই বাবা যখন এখানে এসে আবার চাকরীর খোঁজ করলেন, তখন ও বললো ঃ থাক আব্বা, এবার আমিই একটা কিছু করি।

বাবা বলেছিলেন, কি করবি?

মা কথা এগোতে দেননি। মিনা আর রাবেয়ার দিকে চেয়ে বাবাকে বলেছিলেন, যাদের জন্যে ও পড়াশুনা ছেড়ে চাকরী করতে চায়, এখন পড়াশুনা ছাড়লে যে তাদের কোনো গতিই হবে না।

মিতবাক বাবা এক দোকানে ম্যানেজারির চাকরী নিলেন।

মণি তারপর আবার যে কে সেই। মা একসময় তাই নিয়ে অনুযোগ করেছিলেন। কিন্তু, মণি, মা এখন মনে মনে বলেন,—তোকে আমি ভুল বুঝছিলাম বাবা। তুই যে ছেলেমানুষ। সংসারের জ্বালা না হয় বুঝিসই কিন্তু তোর যে আনন্দ করবারও বয়েস। আর চাকরী তো আমরাই করতে দিলাম না। তোর কি দোষ? কিন্তু—কিন্তু ভুল ভাঙবার সময় দিলিনে কেন, বাবা? ছেলেমানুষ তোকে—

ছেলেমানুষ। ছেলে। চঞ্চল। মায়ের মন চলে যায় আর এক জগতে। তাঁর তখনো বিয়ে হয়নি। ঠিক গরীব ঘরের মেয়ে তিনি নন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন শুধু ছ'টি বোন—তিনি সবার ছোটো, পাঁচ মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর বাবা উৎসাহ এবং অর্থ দুটোতেই প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে যান। এদিকে তাঁর বয়েস বেড়ে চললো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আবহাওয়ার মধ্যে। তাঁর মনে তখন স্বপ্ন দেখা দিতো ভেজা চুলের সসঙ্কোচ গন্ধের মতো। বড়ো চার বোনের ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝে নানার বাড়ী আসতো। উজ্জ্বল এক একটা খঞ্জনীর মতো। মা তাদের কল্পনা করতেন নিজের ছেলে বলে। মনে মনে বলতেন, আল্লা, আমার যেন কোল ভরে ছেলে আসে। কোল ভরা চঞ্চল ছেলে। আর, মোটে একটা মেয়ে। বেশী মেয়ে দিয়ে দিয়ে আমার আর কষ্ট দিয়ো না।

ছেলে এলো। কিন্তু একটি। আর দুটি মেয়ে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছেলের নাক-চোখ-চুল একেবারে ওর বাবার মতো। পার্থক্য শুধু—ওর ওই তৃপ্তির ছাপে। বাবার মুখ গম্ভীর। কিন্তু চঞ্চল ছেলে। খেলো

তো খেলো, না হয় খেলোই না, ছুটে চলে গেল খেলতে। অজস্র ওর খেলার সাথী। ওরই মত চঞ্চল। ছোটোবেলায় মাঝে মাঝে ওর সঙ্গীদের কোলে নিতেন মা। ভারী সাধ হত, সবাই তাঁকে মা বলে ডাকুক। পীড়াপীড়ি করতেন। কিন্তু ছেলেরা লজ্জায় মুখ লুকোতো। এই অভ্যেস তাঁর আজও যায়নি। এখানে আসার পর মণির ঘনিষ্ঠতম বন্ধু জুটলো ইউসুফ। ভারী মিষ্টি ছেলে। মা কতোদিন তাকে বলেছেন, বাবা, তুই আমায় মা বলে ডাকিসনে কেন? মণি আর তুই কি আলাদা?

শুনে মণি ঠাট্টা করে: এক ছেলেতে তোমার মন ভরে না, তাই না মা? আর, আমি বুঝি খারাপ। তাই, আমার রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে চাও। তা ডাক, ইসু! তাতেও লাভ। ভাই পাবো।

মা মিনা আর রেবার দিকে চেয়ে নিয়ে শুধু হাসলেন।

মণি বলে, বুঝলি মিনা-রেবা, মা তোদের দেখতে পারে না। কিন্তু আমি তোদের দলে। আমি তোদের প্রফেসর করে দেব। বলেই এক টান মারে রেবার বেনী ধরে, মিনাকে কাটে চিমটি। দুজনেই কেঁদে ওঠে।

মণি তাড়াতাড়ি ওদের কোলের কাছে টেনে নেয়, আরে রে রে রে কাঁদিসনে, কাঁদিসনে। খেলনা আর গল্পের বই আনতে যাচ্ছি যে।

অমনি কান্না থেমে যায় ওদের। মেয়ে দুটি এমন নেউটে ওর। ভাইয়ের হাজার খুন মাপ ওদের কাছে। ও-ও তেমনি আদর নিয়ে মাথায় তোলে।

কিন্তু প্রফেসরি। মণির সখ, প্রফেসর হবে। অথচ কেন জানি, বাবা কথাটা শুনতে পারেন না। মণিও তাঁর সামনে কিছু বলে না। কোনো-দিনই কিছু বলেনি ও বাবাকে। তাঁকে কেমন যেন এড়িয়ে চলতো, যদিও তিনি ওকে কোনোদিন কিছু বলেন নি। মণির তবু ভয় কাটে না। বিয়ে হয়ে গেল, তবুও না।

বিয়ে হয়ে গেছে। ওই যে বৌমা। হঠাৎ যেন বুকে সূঁচ ফুটলো। সকাল বেলার একটা কথা মনে পড়লো মায়ের। ধারা শ্রাবণের মতি ফুরিয়ে গেল—আমার কথা ও কখনো শোনেনি। আমিই না হয় পার-লাম না। আমার বারণ ও শুনলো না। এক্ষুণি আসছি বলে বেরিয়ে গেল। কিন্তু তুমি? তোমার তো সবই ভালো, বৌমা—

বধূ

সকল কথা ও শুনতো। অথচ আজকে শুনলো না। শোনাটাই যেন সম্ভবও হয়নি। সেই কথাটাই হেমন্তের গাঁও-ঘেরা কুয়াশার মতো মাহবুবাকে ঘিরে থাকে।

সকাল বেলা শাশুড়ী বলেছিলেন ঃ দেখো বৌমা, ওকে যেন বেরোতে দিয়ো না এর মধ্যে। এতোদিন পারো নি, আজকে একটু দেখে-শুনে রেখো।

স্বামী যেন আঁচলে বেঁধে রাখাবার জিনিস।

কিন্তু মিথ্যেই বা কি এমন সে কথা?

সাত-সকালে গোসল সেরে দু'হাতে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে মণি ঘরে এসে ঢুকলো। যেন গাড়ী ছেড়ে যাচ্ছে, এমনি ব্যস্ত-সমস্ত ভাব দেখিয়ে বললো, শীগগীর চিরুনী দাও।

মাহবুবা শুধু বললো, না।

মুখ তুলে তাকিয়ে মণি হেসে ফেললো, সে কি গো, সোয়ামীর কথা শুনলে না। গোনা হবে যে, কবিরা গোনা। মাহবুবা উঠে দাঁড়ালো। না, হাসির কথা নয়। জানো, আজ সকালে কতোবার ধমক খেয়েছি মার কাছে?

ঃ তা ধমক খাওয়ার কাজ করলে খাবেই তো।

ঃ খাবোই তো। চৌদ্দোশোবার বলেও তোমায় ঘরমুখো করা গেল না। কিছুতেই কথা শুনবে না তুমি। এখন মা খোঁটা দেন ঃ এ আবার কেমন বউ?

মণি মুখ গম্ভীর করে বললো, তাই তো, বউ-মানুষের পক্ষে এ তো ভারী অপযশের কথা।

ঃ আবার ফাজলেমি? চললাম আমি।

মণি অস্ত্র ছাড়লো। প্রায় হাঁক দিয়ে উঠলো, যেয়োনা প্রিয়ে—

মাহবুবা ছুটে এসে মণির মুখ চেপে ধরলো ঃ দোহাই তোমার!

ওই এক ভয় মাহবুবার। মণি যেখানে-সেখানে নামটার বাংলা করে তাকে প্রিয়া বলে। মাহবুবা কতোদিন প্রতিবাদ করেছে, এ আবার কি খেয়াল তোমার?

ঃ 'বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?' ডার্লিং শুনতে যতোই মিষ্টি হোক, 'লক্ষ্মী'র কাছে হার মানে।

ঃ নাঃ, নামটা রাখাই ভুল হয়েছে বাপ মায়ের। অন্য কিছু রাখা উচিত ছিলো।

আজিজা, মাশুকা, হাওয়া, পিয়ারী, লাইলী—এই সব ছাড়া। সব কটার মানে প্রিয়া।

ঃ আমি হলে ওসব নাম রাখতাম না।

ঃ পাগল। তা কেন রাখবে? অতো নামের বোঝা কে বইবে? সোজা বাংলা অর্থটাই রেখে দিতে।

ঃ আর পথে-ঘাটে সবাই 'প্রিয়া 'প্রিয়া' করে ডাকতো। মরে যাই বুদ্ধি দেখে!

মণি হার মেনেছে। বলেছে, না, তুমি শুধু আমার প্রিয়া, আমারই আমি ভালোবাসতে চাই তোমায়। বাঁচতে চাই তোমার ভালোবাসা নিয়ে।

ঃ কিন্তু ফের যদি অমন করো, আমি গলায় দড়ি দেব। আজও মাহবুবা ভয় দেখালো।

মণি বললো, কখখনো না।

ঃ বেশ, তাহলে বেরিয়োনা আজ।

মণি গম্ভীর মুখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো ঃ তোমার "ভাষাকে" তুমি ভালোবাসো না।

ঃ দেখো সবই বুঝি। কিন্তু মার গাল শুনতে হয় যে। আর, আমার মনই কি মানতে চায়। ভয় হয়। অন্ততঃ আজকে আমার কথাটা শোনো।

ঃ ভয়? ভয় কি শুধু আমারই জন্যে? যদি অন্যে সইতে পারে, তুমি পারবে না এই দেশেরই মেয়ে? তুমি না সেদিনও ছাত্রী ছিলে?

ঃ তুমি যদি পারো, আমিও পারি।

মণি হেসে ফেললো, এ তো হল বউয়ের কথা। সহধর্মিণী কিংবা, সমধর্মিণী আর হতে পারলে না।

মাহ্‌বুবা একেবারে বুক ঘেঁষে দাঁড়ালো ঃ সে তুমি আমায় বানিয়ে নিয়ো। কিন্তু আজকে অন্ততঃ আমার কথাটা রাখো। আমার মনের যা হয় হোক, মার কাছে আর গাল খাইয়ো না।

: আচ্ছা, আচ্ছা, আমি মাকেই বলে যাবো। তোমার খোঁটা শুনতে হবে না তাহলে।

খোঁটা।

মণির বাবার বন্ধুর মেয়ে মাহ্‌বুবা। দুই বন্ধুতে কথা ছিলো সেই জন্মজীবন থেকে। মাহ্‌বুবার বাবা সরকারী চাকুরে, আগেই এসে জুটেছিলেন এ দেশে। মণিদের আসার পর পড়লেন শক্ত অসুখে। বন্ধুকে ডেকে নিয়ে বললেন, তোমার আমানত এবার আপন ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাও ভাই। আমি শান্তিতে চোখ বুঁজি।

পরদিনই মাহ্‌বুবার গায়ে হলুদের ছোপ পড়লো। বাবা বিদায় নিলেন কয়েকদিন পরেই। শুধু বলে গেলেন, আমার প্রথম সন্তান আদুরে। তোমারও তাই বেয়াই। কি করে ওদের রাখতে হয়, তা তুমি ভালো করেই জানো।.....

আদরেই ছিল মাহ্‌বুবা। শুধু মণির চাঞ্চল্য বন্ধ হল না বলে শাশুড়ী মাঝে মাঝে রাগ করতেন, এ আবার কেমন বউ? সোয়ামীকে কথা শোনাতে পারে না।

বেশী রাগ হলে বলেন, ও মেয়ে জানে, বন্ধুত্বের একরারের দায়ে ওকে ঘরে আনা হয়েছে। কেউ ওকে ঠেলতে বা ফেলতে পারবে না। সেই জন্যেই তো ও আমার ছেলেকে অবহেলা করে।

অবহেলা।

কিন্তু বিয়ে যখন হল, তখন কতটুকুই বা ছিলো ও? সবে কৈশোর পেরোচ্ছে তখন। লজ্জাটা তখনও ঘন মধুর হয়ে ওঠেনি, স্বামীর মর্ম ধরা দেয়নি মনের কাছে। এজেনের বিষয় তো প্রায় না বুঝে-সুঝেই 'হু' বলে ফেলেছিলো। বিয়ের পর মাঝে-মাঝে খেলতেই বসে যেত মিনা আর রেবার সাথে।

একদিন—

রেবার সেদিন দাঁত পড়েছে একটা। মাহ্‌বুবা বললো, দাঁড়া ইঁদুরের গর্তে ফেলবি, ছোটো দাঁত উঠবে তাহলে। মণিরই বা কতো বয়স? সেও এসে জুটলো।

চললো ইঁদুরের গর্ত খোঁজা।

একটা পাওয়া গেল। হোক, না হোক, সবাই রায় দিলো—এইটিই ইঁদুরের গর্ত। মাহ্‌বুবা বললো, রেবা বল—ইঁদুর, ইঁদুর, আমার দাঁত নিয়ে যা, তোর দাঁত দিয়ে যা, তোর দাঁত দিয়ে যা,—তিনবার বলে দাঁত ছেড়ে দিবি।

ঠিক এমনি সময়ে শাশুড়ী হাঁকলেন ঃ বৌমা। বয়েস কি বাড়ছে, না কমছে? সোয়ামীর সামনে খেলা।

লজ্জায় মরে গিয়েছিলো মাহ্‌বুবা। তারপর একসময় মণির কোলে মুখ লুকিয়ে কি কান্না।

মণি হাত বুলিয়ে দিয়েছিলো গায়ে, আমি তো বকিনি। মাও তোমায় ভুল বুঝেছেন। মাঝে মাঝে খেলারও দরকার আছে বৈকি। আমি মাকে বলে দেব।

মাহবুবা স্বামীকে বোধহয় সেই দিনই প্রথম চিনেছিলো। তারপর শুরু হল ভালো করে চেনা।

সে চেনা কি শেষ হয়েছিলো? সে চেনা-জানা পাকা-পোক্ত হবে যাকে দিয়ে, তার যে পৃথিবীতে আসতে এখনও ছ'মাস বাকী।

আর খোঁটা?

ঘরে রাখতে মাহ্‌বুবাই না হয় পারলো না। ক্ষমতা নেই দায়ে পড়ে আনা বউয়ের। কিন্তু না, এই অমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু?

বন্ধু

বন্ধু। লোকে বলতো তাই।

কিন্তু ইউসুফ জানে, তার চেয়েও বেশী। অথচ পুরো দু'বছরের আলাপও নয়। ক্লাসের আর দশজন ছেলের সঙ্গে যেমন আলাপ হয়, তেমনিভাবে আলাপ হয় মণির সাথে, তারপর দেখলো মণি চঞ্চল।

ইউসুফও চঞ্চল।

বন্ধুত্ব হল।

বাড়ীতে দাঁড়াবার অভ্যাস কারুরই নেই। ফাঁক পেলেই দু'জন পথে পথে ঘোরে। মণি উলুবেড়ের গল্প বলে, ইউসুফ ত্রিপুরার এক গাঁয়ের। বাংলাদেশের দুই আঞ্চলিক ভাষায় গল্প আর ফুরোয় না।

শেষকালে মণি বলে, খাসা তোর 'কিতা কন।'

ইউসুফ বলে, কিন্তু যাই বলিস, আঞ্চলিক ভাষায় যতোই তফাৎ থাক, বাংলা ভাষাটাকে আমরা দুজনে সমানই ভালোবাসি।

দুজনেই তা জানে। আটচল্লিশ সালের ভাষা আন্দোলনের গল্প একদিন ইউসুফই বলেছিলো। কি উৎসাহ তার বলতে। আর, মণি সে তো কথা শুনছিলো না, যেন রসগোল্লা গিলছিলো। শেষে বলেছিলো ঃ উঃ, ভাষাটাকে পায়ে ঠেলে ওরা আমাদের সংস্কৃতিটাকেই খুন করতে চায়। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাকে অপমান করে কি করে যে দেশের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে বুঝিনে। এরই নাম কি বৃহত্তর স্বার্থরক্ষা?

ঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের মঙ্গল তো ওরা চায় না। ওরা চায় মুষ্টিমেয়র স্বার্থরক্ষা।

তারপর অনেকদিন কথা হয়েছে এসব নিয়ে। মণি বলেছে ঃ বাংলা-দেশটাকে কেউ ভালোবাসে না রে। চোর-জোচ্চোররা এদের ভয় করে। তাই নিজেদের দোষ ঢাকবার জন্যে অমনি দাঙ্গা বাধিয়ে দিলো। আমরা কিন্তু ভালোবাসব দেশকে, আর আমাদের ভাষাকে। আমাদের ভাষাকে আমরা রাষ্ট্রভাষা করবোই। যতো বাধা আসুক, কিছুতেই থামবো না।

ছেলেমানুষের মতো উক্তি। মণির মুখের সতৃপ্ত ভাবটার দিকে চেয়ে ইউসুফ বলে, তুই পারবিনে। তুই বড়ো আত্মসন্তুষ্ট মানুষ।

মণি হাসে, সে দেখা যাবে। কিন্তু এখানে কোথায় কি হয়, জানা দরকার। তুই আমায় সভা-সমিতিতে নিয়ে যাবি তো? সব জায়গা চিনিনে আমি—

সেই থেকে দুজনেরই দু'জনের বাড়ীতে যাতায়াত।

ইউসুফের অসুখের সময় মণি দিনে পাঁচবার করে দেখে গেল। মণির বাড়ীতে গিয়ে মায়ের মুখে ইউসুফ শুনলো, বাঃ, দুটিতে তো বেশ মানিয়েছে। তুমি আমায় মা বলো, বাবা।

ইউসুফ লজ্জায় বাঁচে না। সে লজ্জা ওর কোনোদিন কাটলোনা অথচ মণি হয়ে দাঁড়ালো ভাইয়েরও বড়ো। মুখ ফুটে 'মা' না বললে কি মণিকে ভাই বলা যায় না?

মণি কিন্তু মুখ টিপে টিপে হাসে, তুই ভাবিসনি, ইস্। তোকে আমার বোয়াই করে নেব।

ঃ তার মানে? কাঁঠালের গাছেরই দেখা নেই, তুই এদিকে গোঁফে তেলের মেঘনা বইয়ে দিলি?

ঃ কে বলে, দেখা নেই? ঘরের বউটা কি মিথ্যে?

মা আর মাহ্‌বুবার সামনেই বলে। মাহ্‌বুবার লজ্জা দেখে ইউসুফও লজ্জা পায়। বলেঃ বাঁদর।

মণি বলে, বাঁদর বলে ভালো করলিনে, বেয়াই যখন করতেই হবে। যাকগে, এবার একটা বউ নিয়ে আয় শীগ্‌গীর। নইলে ছেলেমেয়ের বয়েসের তাল থাকবে না।

পথে বেরিয়ে ইউসুফ বলে, তোর বাবা যা করেছেন, আমাদেরও তাই করতে হবে? এই যুগেও?

ঃ ওটা ভালোই রে,—যদি ছেলেমেয়ে পরে আপত্তি না করে। নিজেকে পল্লবিত করে রাখতে বেশ লাগে।

ঃ তুই ভীরু। ঝড়-ঝাপটার মোকাবেলা করতে তুই কোনদিন পারবিনে।

ঃ কেন?

ঃ দুনিয়াকে তুই বড্ডো বেশী ভালোবাসিস।

মণি বলে, সেজন্যই তো পারবো। তুই দেখে নিস।

কালকেও মণি ওই কথাই বলেছিলো। শোভাযাত্রা বেরোবে, পুলিশ বেরোতে দিলো না। মণি বললো, ভালবাসি যাকে, তার জন্যেই তো লড়তে হয়। দুয়াল্লিশ ধারা ভেঙে জেলেই যাই। আজ তারিখ একুশ, আর আমার বয়েসও এখন একুশ। দেখি কোন একুশ জিততে পারে।

ও-ই জিতলো। সকাল বেলায় ধরে নিয়ে গেল। সন্ধ্যার দিকে ফিরে এলো। বললো, মাইল দশেক দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলো।

ঃ তবু জিতেছিস। আমায় তো ধরলোও না।

মণি বললো, না রক্ত গেছে আমার।

ইউসুফ চমকিত হল। লাল লোহার ওপর ঘন ঘন হাতুড়ি পড়লে যেমন শব্দ হয়, তেমনি ভাবে বেরিয়ে এলো কথাগুলো। গুলী চলেছিলো বিকাল বেলা, তারই প্রতিশব্দের মতো।

আজকেও বেরিয়েছিলো দু'জন। এবং শোভাযাত্রার সাথে চলতে চলতে আজকেও শুনলো গুলীর আওয়াজ।

ইউসুফ মণির দিকে তাকিয়ে চকিত হয়ে বললো ঃ শীগ্‌গীর বাড়ী চ'।

কিন্তু বাড়ী এসেই ভুল করলো। হাসপাতালে নিয়ে গেল না, এর ওপর আবার হাঙ্গামা না বাঁধে পুলিশের সাথে, সেই ভয়ে। কিন্তু হাসপাতালে গেলে তো এতো রক্তপাত হত না। এ কাণ্ড ঘটতো না। মণি, — ইউসুফ হঠাৎ কেঁদে উঠতে চায় ঃ মণি, তুই আমায় ক্ষমা করিসনে। কোনো দিন না।

কিন্তু বেরোবার সময় ইউসুফ বলেছিলো, একটু দেখেশুনে চলিস রে।

মণির চোখ দুটো তখন চৈত্রের চরের মতো রুদ্র হয়ে উঠেছিল, ভাপুরুষ।

ঃ না, করিস। মনটা নিমেষে সংযত করে নেয় ইউসুফ—করিস যখন তোর কাজ শেষ হয়।

সে তারে দীপক

সইতে না পেরে বাবা কোথায় সরে রয়েছেন। নিঃসঙ্কোচে ইউসুফ ডাক দিলো, মা, কতোক্ষণ আর বসে থাকবে! মুর্দ্দাকে আজাব দেওয়া হচ্ছে যে। ওকে ছেড়ে দিয়ে এবার আমাদের আশীর্বাদ করো, ওর কাজ আমরা শেষ করি।

মা মুখ তুললেন, চোখ দুটি যেন গঙ্গোত্রী ঃ—কে, কে মা বললি?

ইউসুফ বললো, এখনও কাঁদবে, মা? কিন্তু বলিই বা কি। বাংলা ভাষা আর বাংলা দেশের মা,—দুটোই তো সমান। না খেয়ে খেয়ে তোমরা কি শুধুই কাঁদবে মা?

মুহূর্ত কয়েক চুপ করে রইলেন মা। শ্রাবণের মেঘ যেন কোন মন্ত্রবলে বৈশাখের মেঘে পরিণত হল। শেষে বললেন, না! মণির ভাই-বোন কি তাই দেখবে বসে বসে?

আবার একটু নীরবতা। এক হাত ছিলো মাহ্‌বুবার কাঁধের উপর, অন্য হাত বুলিয়ে গেলেন মিনা আর রেবা হয়ে ইউসুফ পর্যন্ত।

মাহ্‌বুবা অস্ফুট স্বরে বললো, আর একজন যে আছে মা! তোমার ছেলেমেয়েকে ডাকলে। কিন্তু আমার ছেলে?

ঃ তাকেও রে, তাকেও। যে যেখানে আছে, সবাইকে।

আবার বৃষ্টি নামলো।

দৃষ্টি

আনিসুজ্জামান

পঁচিশ বছর কেরানীগিরি করলে চোখের আর কি শক্তি থাকে! তাছাড়া, চোখ খারাপ অনেক দিনের। চশমা নিয়েছিলেন সেই যখন ক্লাশ সেভেনে পড়তেন। সেদিন রাত্রে ঝড়ের সময় জানালার ছিটকিনি খুলে কপাটটা ধাক্কা দিল টেবিলটায়। টেবিলের ওপরে রাখা মোটা লেনসের চশমাটা টেবিল থেকে পড়ে গেল নীচে। খান দুই ইট দিয়ে তক্তপোষটা উঁচু করা ছিল। চশমাটা সুতো দিয়ে বেঁধে পরা চলত, কিন্তু দৌড়ে আসতে গিয়ে সালেহা পা চাপিয়ে দিল তার ওপর।

আরেকটা যে কিনবেন, সে ভরসা সাদত সাহেবের আছে। তবে কবে সে প্রশ্ন অবান্তর। কারণ, পেনসনের টাকা ঠিকমত পাচ্ছেন না। আসাদ যা মাইনে পায় তাতে সংসার কোনমতে চলে। সালেহার বিয়ে দেওয়া দরকার, কিন্তু এ অবস্থায় সম্ভব হচ্ছে না। আসাদের বিয়ে হয়েছে অবশ্য। আল্লায় দিলে একটা বাচ্চাও হবে এবার।

চশমাটা ভেঙ্গে যাওয়ায় বড় অসুবিধায় পড়েছেন সাদত সাহেব। চোখ না থাকলে মানুষের আর যেন কিছুই থাকে না। ঘর ছাড়া কোথাও বেরোন না—তাও ঘরের জিনিসগুলো যদি অস্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে মানুষ বাঁচে কি করে! বোবা কথা না বলতে পারলেও দেখতে তো পায়, তিনি ভাবেন—আবার ভাবেন, চোখে দেখেই বা কি হয়, যদি কথা না বলতে পারা যায়! চিন্তাগুলোকে ঠেলে দিয়ে সাদত সাহেব হাঁকেন, 'সালেহা, একটা পান দিয়ে যা তো মা।'

পান নিয়ে আসে হাসিনা। আসাদের বৌ। 'পান নেন' শুনেই বুঝতে পারেন সাদত সাহেব। বলেন, 'সালেহা কোথায়?'

'আছে ঘরে।'

'তাকে দিয়ে পাঠালেই পারতে। তুমি এ সময়ে কম নড়াচড়া করো মা।'

স্নেহের এ অভিযোগ শুনে হাসিনা হাসে। ভারী ভাল মানুষ তার শ্বশুরটি। সে জানে কি আশায় উজ্জীবিত হয়ে ও কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে বুড়ো শ্বশুরের মুখ থেকে। অন্য কথায় আসে হাসিনা। বলে, 'চশমাটা আপনি কিনে নিলেই পারতেন। কিছু টাকা ঘরে ছিল—আর কিছু ধার করে, সামনের মাসে তা শোধ দেওয়া যেত।' সাদত সাহেব হেসে উত্তর দেন, 'এ সময়ে ঘরে টাকা-পয়সা কিছু রাখা দরকার। পুরোনো লোকের অনেক সেবা করলে মা—এবার নতুন লোকটির যত্ন নিতে হবে।' হাসিনা চলে আসে।

সালেহা এল এবার দৌড়ে। বললে, 'আব্বা, কি হয়েছে জান?'

'কি মা?'

'মেডিক্যাল হোস্টেলে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে ছাত্রেরা বিক্ষোভ করছিল। পুলিশ গুলী চালিয়েছে।'

'গুলী!' সাদত সাহেবের কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর।

'হ্যাঁ। কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে, লাঠি চালিয়ে, গ্রেপ্তার করেও কিছু হয়নি। শেষে গুলী চালিয়েছে। ছ'জন মারা গেছে।'

'ছ'জন!'

'ছ'জন মারা গেছে, আরো আহত হয়েছে।'

'তোকে কে বললে?'

'বাচ্চু। ও এতক্ষণ ছিল সেখানে। গুলী চালাবার পর চলে এসেছে।'

'কি আশ্চর্য!' সাদত সাহেব এতক্ষণ তাঁর চেতনায় ফিরে আসেন। বৃটিশ আমল এর চেয়ে খারাপ কি ছিল? এ কয় বছরে কম জায়গায় তো আর গুলী চলল না।

'আমাদেরকে কি বোবা হয়ে থাকতে হবে নাকি!' সালেহার গলার স্বর ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে। সে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

রুদ্ধ ঘরে সাদত সাহেব ভাবতে থাকেন, মানুষ থাকার অনুপযুক্ত হয়ে উঠছে যেন দুনিয়াটা, আরো নানান কথা।

ভাবনার মাঝে আসাদ এসে পড়ে। আবার তিনি জিজ্ঞাসা করেন: 'সত্যিই ছ'জন মারা গেছে?'

'হ্যাঁ।' আসাদ অবসন্নভাবে বলে।

বৃদ্ধ আবার চিন্তায় ডুবে যান।

ঘুম থেকে উঠেই সাদত সাহেব খোঁজ নেন আসাদের। হাসিনা বলে, 'অফিসে চলে গেছেন।'

'এত সকালে!'

'সকাল আর কোথায়! আজ শুক্রবার, সকালে অফিস।'

সত্যিই, সকাল আর কোথায়! উঠতে দেরী হয়ে গেছে তাঁর। রাইফেলধারী, সৈন্যদের ঘন ঘন পদশব্দ কাল অনেক রাত জেগে শুনেছেন তিনি। চা নিয়ে এসে সালেহা বলে, 'ভাইয়াদের অফিসে আজ ধর্মঘট হতে পারে। ভাইয়া বললে যদ্দুর সম্ভব চেষ্টা করবে। কিন্তু ভাইয়ার যদি চাকরী চলে যায়, আব্বা!' গভীর আশায় ভর করে কথা বলতে গিয়েও সালেহার মনে আসে প্রচ্ছন্ন হতাশা।

সাদত সাহেব অন্যমনস্কভাবে বলেন, 'না চাকরী যাবে না।' তবু কথাটা তাঁকে ভাবিত করে তোলে। ভাবনার কি আর শেষ আছে মানুষের।

পথ-ঘাট নিস্তব্ধ। গাড়ী-ঘোড়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না-- আজ সব বন্ধ। চারজনের বেশী লোক এক সাথে চলছে না। সব তাই কেমন মৃত্যুর মত স্তব্ধ। কিন্তু মৃত্যুর শান্তি নয়; একটা চাপা উত্তেজনায় কাঁপছে সারাটা শহর।

মৃত্যুর কথায় নিজের মৃত্যুকে মনে পড়ে যায় বৃদ্ধের। তিনি মরে যাবেন, তারপর কে থাকবে? হয়ত আসাদও যাবে। কে রইবে তখন? আসাদের ছেলে-মেয়েরা? নিজেকেই উত্তর দেন। নিশ্চিন্তও হন কিছুটা; খানিকটা ভরসাও খুজে পান সে অনাগত উত্তরাধিকারের চিন্তায় যেন। তাঁর সজীব রক্তের উষ্ণতায় বৃদ্ধের হিম হয়ে আসা বুকটাও উষ্ণ হয়ে ওঠে।

কে যেন কড়া নাড়ে। সালেহাকে ডেকে দেখতে বলেন তিনি। দরজা খোলার আওয়াজ পান। সালেহা বলছে, 'কি খবর হালিম ভাই?' উত্তরটা আর শুনতে পান না তিনি। হালিম ছেলেটা আসাদের সাথে চাকরী করে, কাছেই থাকে। কি ব্যাপার।

কয়েকজনের পদশব্দ শুনেত পাওয়া যায় পাশের ঘরে। হাসিনা আর সালেহা ডুকরে কেঁদে ওঠে। সাদত সাহেব বলেন, 'কি হল সালেহা, —হাসিনা'—তক্তপোষ থেকে পা নামিয়ে চটি পায়ে দেন। চশমা নেই,

এগুতে পারছেন না। সালেহা এ ঘরে আসে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'ভাইয়ার গুলী লেগেছে—মারা গেছে।' এবার থেমে থেমে হালিমের গলা শোনা যায়ঃ 'অফিস স্ট্রাইক হয়ে প্রোসেশন বেরিয়েছিল—পুলিশ গুলী চালায়। সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় ও। হাসপাতালে দিলে লাশ যদি না পাওয়া যায়, সেই ভেবে ডাক্তারখানা নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে থেকে নিয়ে এসেছি।'

সালেহা সাদত সাহেবকে ধরে এ ঘরে নিয়ে আসে। সে কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। হাসিনা আছড়ে পড়েছে মৃতদেহের ওপর। কাঁদছে।

তার পেটের বাচ্চাটা বুঝি হঠাৎ নড়ে উঠল ...

সাদত সাহেব এতক্ষণে কাঁদতে থাকেন। মৃতদেহের ওপর হাত বুলাতে থাকেন তিনি। দেখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকেন। 'আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে। আসাদ কোথায় রে? আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে।' কিন্তু দৃষ্টি কেবল ঝাপসাই হয়ে যাচ্ছে তাঁর—অস্পষ্টতা বেড়েই চলেছে। মনে হচ্ছে এ অস্পষ্টতা আর কোনদিন দূর হবে না, আর কোনদিন দেখতে পাবেন না। কোনদিন না? হাসিনার বাচ্চাটাকেও কি দেখতে পাবেন না?

হাসিনার না হওয়া বাচ্চার চেহারাটা মনের ভেতর আঁকতে থাকেন, দেখতে চান প্রাণপণে। কান্নাটা থেমে আসে আস্তে আস্তে।

বরকত যখন জানত না সে শহীদ হবে

বশীর আল্‌হেলাল

খুব ছোট গ্রাম। নাম বাবলা। দুই বড় গ্রামের মাঝখানে পড়েছে বলে বুঝি আরো ছোট মনে হয়। চারদিকে ফাঁকা খাঁ-খাঁ মাঠ। তার মধ্যে পূর্ব আর পশ্চিমের মাঠ এত বড় যে দিগন্তের রেখাকে শিশুর চোখের কাজল-রেখার চেয়েও ক্ষীণ দেখায়। এই অঞ্চলে এই রকমের মাঠকে বলে ছাতি-ফাটা মাঠ। অর্থাৎ, ধরুন, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের গ্রীষ্মে খর-দুপুরে ওই মাঠ পেরিয়ে যদি কেউ এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যায়, তৃষ্ণায় তার ছাতি অর্থাৎ বুক ফেটে যেতে পারে।

বাংলার এই অঞ্চলে মাঠে গাছও থাকে না। থাকলে কদাচিৎ থাকে। হয়তো একটা অশ্বত্থ, কি শিমুল, কি একটা কালো বুড়ো আম-গাছ। তালগাছও থাকতে পারে। অবশ্য যদি তালগাছ থাকে, একসঙ্গে পাশাপাশি দু'তিনটি, এমনকি দশ-বারোটিও থাকতে পারে। তখন ওই তালগাছগুলোকে একটু দূর থেকে দেখলে মনে হবে, বুঝি দুই হা-হা প্রান্তরের দৈত্যসম্রাট তাঁদের সাম্রাজ্য-ভাগের সীমানির্দেশের জন্যে ওই তালগাছের খুঁটি পুঁতেছেন। আসলে ব্যাপারখানা তাই। কোনো দূর অতীতে হয়তো দুই ভাই কিংবা অন্য রকমের দুই শরিকের মধ্যে জমি নিয়ে অশান্তি, কলহ হয়েছিল। হয়তো মারামারি ফাটাফাটিও হয়েছে। হয়তো চৈত্রমাসের তৃষ্ণার্ত মাটির ধুলোয় কিংবা আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার পেলব কাদায় ওখানে রক্তও ঝরেছিল। তারপর গ্রামের মোড়ল ব্যক্তি-দের সালিস বসেছে। মীমাংসা একটা হয়েছে, বাঁটোয়ারা হয়েছে। এক শরিক তখন তার জমির নতুন আলে তালের আঁটি পুঁতে দিয়েছে। আর সেই হচ্ছে আজকের ওই ফাঁকা প্রান্তরের তাল-বীথি। নিষ্ঠুর কোনো হালাকুর তলোয়ারের আঘাতের কঠিন কালো চিহ্নের মতো। এখন ওখানে শেষ-ফাল্গুনে চিল-দম্পতি ডিম পেড়ে বাচ্চা ফোটাবে বলে বাসা বাঁধে। আর যদি অশ্বত্থ কি শিমুল হয় তাতে বাসা বাঁধে দাঁড়কাক।

এই হচ্ছে এই অঞ্চল। আর তার মধ্যে ছোট এই গ্রাম, নাম বাবলা।

আর গ্রামের এই বাবলা নামই বা কেন হলো? কে জানে সে-ইতিহাস? কত ইতিহাসই আমাদের জানা হয় নি, জানতে বাকি, কিংবা জানলেও ভুলে গেছি। এই অঞ্চলে বাবলা খুবই সাধারণ গাছ। সব গ্রামের কোল ঘেঁষে ঘুটিং-ভরা অনাবাদি জমি, ন্যাড়া ঢিপি কি ঘোলা জলের সেচের পুকুরের পাড়ে এই বেঁটে কালো গাছগুলি রয়েছে, তার কোনো কোনোটি কুঁজো, হয়তো যখন শিশু ছিল বৈশাখী ঝড়ে মাজা ভেঙে গিয়েছিল। ওই গাছ যে কোন্ কাজে লাগে অন্তত আমি তো জানি না। একটুখানি সৌন্দর্য আছে ঝিরি-ঝিরি পাতায়, কিন্তু সেও কঠিন কাঁটায় আকীর্ণ। ওই গাছের তলা দিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে গেলে, কত সাবধানে আঙুল টিপে-টিপে হাঁটতে হয়, মাটিতে কাঁটা থিক-থিক করে। তাহলে যদি ওই গাছ কোনো কাজেই না লাগে তো ওর তলায় কেউ যায় কেন? যাওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে। কোনো রাখালের গরুর পালে একটা ঠ্যাটা গরু আছে। সে মাঠের শ্যামল আলের কোমল ঘাস ফেলে ওই ন্যাড়া বাবলা-তলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দু-একবার মাথা তুলে লম্বা জিভ বের করে বাবলার পাতা ছোঁয়ার চেষ্টা করেছিল, এখন মাথা নামিয়ে মাটিতে নাক ঠেকিয়ে ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ছে, কিন্তু ওখান থেকে নড়ছে না। রাখাল ওটাকে মুখ-খারাপ করে ডাকছে, কিন্তু, মনে ওর কী ভাব জেগেছে কে জানে, গরুদের মধ্যেও কবি থাকে, একটু নড়ে-চড়ে, হয়তো গিয়ে গাছের গুঁড়িতে ঘষে পিঠটা একটু চুলকে নিল, কিন্তু ওখান থেকে নড়ল না। ঝিরঝিরে হাওয়ায় জায়গাটা কি বেশ ঠাণ্ডা? ওই হাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে ওই গরু কি উদাস হয়ে গেছে? তখন রাখাল পাঁচন উঁচিয়ে ছুটে যায়। হ্যাঁ, তাকে ওই বাবলা-তলার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হয়, কারণ হয়তো বাবলার কাঁটা ওখানে থিক থিক করছে।

তবে বাবলাগাছে যখন গ্রীষ্মে ফুল ফোটে, হলুদরঙের ছোট-ছোট গোল-গোল ফুল, অসংখ্য ফোটে, কোমল ঝুরঝুরে তাদের রেণুর মতো পাপড়ি, দেখতে ভালোই লাগে। আরো একটা ব্যাপার আছে। বাবলার ফুল যখন ফোটে নি, তখনো কুঁড়ি, ফোটার আগে-আগে, সবুজ-রঙের ঠিক নাকছাবিটির মতোই হয় দেখতে, মেয়েরা নাকে পরে। ওই কুঁড়ির সরু বোঁটা নাকের ফুটোয় কেমন সুন্দর বসে যায়। মনে আছে,

সেই ছেলেবেলায় আমিই আমার বুবুর জন্যে ওইরকম পা টিপে-টিপে গিয়ে বাবলা-ফুলের কুঁড়ি ছিঁড়ে এনেছি। পায়ে কাঁটা যে কখনো ফোটে নি এমনও নয়। ওহ্, সেই কাঁটা ফোটার কথা মনে পড়লে এখনো গা শিউরে ওঠে।

বাবলাগাছের আর এক উপযোগ আছে। সে বাবলার ফল। বিচিত্র সেই ফল। ছয় থেকে ন'ইঞ্চি লম্বা। যেন হালকা সবুজ-রঙের ছেঁড়া মালা। গাছ-ভর্তি অসংখ্য ঝুলবে। অনাদরে ঝুলবে। কেউ তাকিয়ে দেখবে, কেউ দেখবে না। যখন পাকবে হয়তো দু-একটি ঘর-পালানো ছেলে কতকগুলো পেড়ে ভেতরে রয়েছে যে খোঁপে-খোঁপে কালো শক্ত ক্ষুদে সুন্দর বিচিগুলি, সেগুলি নিয়ে খেলবে। কিন্তু, আসল উপযোগ হচ্ছে, পাকার আগে, বুঝি কার্তিক-অঘ্রাণ মাসে, যখন তখনো আমনের খড় ওঠে নি খামারে, গোয়ালারা গাদা-গাদা পেড়ে নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে গাইগুলোকে। বাবলার ফল খেলে গাই বেশি দুধ দেয়। আর স্কুলের ছাত্র-বেলায় আমরা বাবলার ফাটা গা বেয়ে গড়িয়ে পড়া আঠা খুঁজতাম, যা দিয়ে হয় গঁদ।

এই হচ্ছে বাবলার গাছ, সারা রাঢ়-বঙ্গ জুড়ে অসংখ্য রয়েছে যত্রতত্র। কিন্তু বাবলা নামে গ্রাম ওই একটি। ওই গ্রামেই জন্ম আবুল বরকতের। ছোট, সামান্য একটি গ্রাম। এমন কিছুই নেই ওখানে। হাট বসে না, স্কুল নেই, ডাকঘর নেই। নিম্নমধ্যবিত্ত কয়েক ঘর মুসলিম পরিবার আছে, ওরই মধ্যে দু-চারটি হয়তো একটু বেশি সঙ্গতি-ওয়ালা, একটু তাদের বেশি জমি আছে। আর যারা বেশিরভাগ আছে, পরের জমিতে খেটে-খাওয়া নিম্নশ্রেণীর ক্ষেত-মজুর।

গ্রামের পূর্বে-পশ্চিমে বিস্তৃত মাঠ, ফাঁকা খাঁ-খাঁ মাঠ। পূর্বের মাঠ এতই বড়, এতই খাঁ-খাঁ, দূরে, বহু মাইল দূরে সামান্য দক্ষিণ কোণ ঘেঁষে চিনির যে একটি কল রয়েছে ভালো করে নজর করলে তার চিমনিটিকে দেখা যায়, মনে হয় কালো একটি কাঠি ওখানকার নরম মাটিতে ঘাসের মধ্যে কেউ পুঁতে রেখেছে। আমরা ছেলেবেলায় ওই দিকে গিয়ে কখনো কখনো বিকেলের অনুষ্ণ আলোয় ওই চিমনিটির দিকে তাকিয়ে থাকতাম। হয়তো ওটাকে হারিয়ে ফেলতাম, আবার খুঁজে পেতাম। এই এখানে তো মুর্শিদাবাদ জেলা, কিন্তু ওই ওখানে নদিয়া।

ওই যেখানে চিনির কলটি আছে, বহু দূরে, তার চারপাশে রয়েছে মাইল-মাইল জুড়ে আখের ক্ষেত। ওরই মধ্যে কোথাও ছিল সেই আমবাগান, এখন নেই, যেখানে স্বাধীন বাংলার হতভাগ্য শেষ নবাব সিরাজুদ্দৌলার বাহিনীর সঙ্গে লর্ড ক্লাইভের বাহিনীর যুদ্ধ হয়েছিল। সিরাজ হেরে গিয়েছিলেন। কত বিচিত্র সেই ইতিহাস। কারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল? ভাড়াটে সব সৈনিক, তারা এই দেশেরই লোক। তখন নবাব করত নবাবি, খাজনা তুলত, কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে দেশের মানুষের সম্পর্ক থাকত না। সেই ইতিহাসের দিকে এই এত দূর থেকে আমরা তাকিয়ে থাকতাম। আমাদের চোখে সেই চিনি-কলের চিমনিটির তাই এত গুরুত্ব ছিল।

আর পশ্চিমের মাঠ চিরে জেলা বোর্ডের রাস্তা একটি আছে, উত্তর-দক্ষিণ, বাবলা থেকে আধ-মাইল দূরে। এ-তল্লাটে মাটি এঁটেল। ওই কাঁচা সড়কের কাদায় বর্ষায় গরু-মোষের গাড়ির চাকা আটকে যায়। গাড়োয়ানকে তখন গাড়ি থেকে নেমে কাঁধ লাগিয়ে সেই চাকা ঠেলতে হয়।

এখন তো ইতিহাসের এঁটেল পথের কাদায় দেশটারই চাকা আটকে গেছে। একদিকে হিন্দু, অন্যদিকে মুসলমানরা ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দিয়েছে অবশ্য। ফলে ইতিহাস কোনোদিকেই নড়ছে না। মানুষ তো গরুর মতোই গাধা। আর তাদের নেতারা সব শয়তান।

ওই যে জেলা বোর্ডের এঁটেল মাটির কাঁচা পথ, ওটা দুটো বৃহৎ, বর্ধিষ্ণু গ্রামকে যুক্ত করেছে। একটি তালিবপুর, এখানে মুসলমান বেশি, কিন্তু হিন্দুরাও আছে। অন্যটি কাগ্রাম, ওখানে হিন্দু বেশি, কিন্তু মুসলমানও আছে। এই দুইয়ের মাঝখানে বাবলা, এখানে হিন্দু নেই। উত্তরের ছোট মাঠটি পেরোলে তালিবপুর। দক্ষিণের ছোট মাঠটি পেরোলে কাগ্রাম। উভয় গ্রামেই অনেক কিছু আছে। হাই স্কুল আছে, ডাকঘর আছে, হপ্তায় দু-দিন হাট বসে। জেলাবোর্ডের দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। বড়-বড় ব্যক্তিরা আছেন, বড়-বড় অফিসার, অবশ্য বেশিরভাগ কলকাতায় প্রবাসী। রাজনৈতিক নেতারা আছেন, যাঁদের কেউ এমনকি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হয়েছেন। সে যে কী এক সময় ছিল। একদিকে মুসলিম লীগ, অন্যদিকে কংগ্রেস। আমার বাড়ি তালিবপুর। মস্ত এক জমিদারবাড়ি আমাদের গ্রামে। গড় দিয়ে

ঘেরা সেই প্রাসাদ ছিল বিপুল, হাতিশালে সত্যি হাতি ছিল, ঘোড়াশালে ঘোড়া ছিল, হাতি ঢোকার মতন আলিশান গেট ছিল। মনে হতো ইতিহাস সত্যি কথা বলছে। ছিল খেলাধুলো, নাটক, গান। নাটকের অপসারণযোগ্য মঞ্চ ছিল। একটা নয়, কয়েকটা করে গ্রন্থাগার ছিল। হিন্দু-প্রধান কাগ্রামে হয়তো সংস্কৃতির আয়োজনটা বেশি ছিল। কিন্তু তালিবপুরের ফুটবল-দলের খুব নাম। যাত্রা-দল ছিল, লেটো আর আলকাপ-এর দলও ছিল। কবিয়াল ছিল। তালিবপুরে মুসলমান ছেলেদের কেষ্টযাত্রার দল ছিল। যে ছেলেটি বিনোদিনী রাই অর্থাৎ রাধা সাজত সে দর্শকদের পাগল করে দিত। সে গাইত: 'মরিলে ঝুলায়ে রেখো তমালেরই ডালে গো'। তমালের একটি গাছও ছিল আমাদের গ্রামে, বিরাট এক পুকুরের পাড়ে কালো বেঁটে গাছটি। ওর তলা দিয়ে সত্যি রাধারা পুকুরে নাইতে যেত। ঈদের চাঁদ উঠলে অমনি আবদুল আলিমের এক ওস্তাদ গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে তাঁর দল নিয়ে হ্যাজাকের আলোয় গাঁয়ের পথের ধুলো উড়িয়ে পাড়ায়-পাড়ায় গেয়ে ফিরতেন: 'মন, রমজানের ওই রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ'। আবদুল আলিমেরও বাড়ি এই তালিবপুরে।

বাবলার ছেলেরা কিছু পড়তে যায় কাগ্রামের স্কুলে, কিছু তালিবপুরের স্কুলে। হয়তো বেশি যায় তালিবপুরে। তালিবপুরের ফুটবলের মাঠটি বাবলা থেকে ওই তো দেখা যায় গ্রামের উপান্তে। ওখানে বাবলার কেউ-কেউ খেলতেও যায়।

বরকতের নাম যে বরকত, আমি জেনেছিলাম সম্ভবত সে শহীদ হওয়ার পরে, তার আগে জানতাম না। তার ডাক-নাম ছিল আবাই। ওই নামেই জানতাম। এই গল্প লিখতে বসে আমার চোখে পানি আসছে। সে আবাই ভাষা আন্দোলনে শহীদ হয়েছে বলে নয়। ইতিহাসের চাকা বসে গেল এঁটেল মাটির কাদায়। কত ঠেলাঠেলি চলছে। চলুক। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে এই এতটুকু আমি এবং আরো কত মুসলমান তরুণ কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্না আর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির জয়ধ্বনিতে চোঙা ফুঁকে গলা বসিয়ে ফেললাম। আবাই পড়ত আমাদের গ্রামের স্কুলে। আমি একেবারে নিচের দিকের কোনো ক্লাসে, ও একেবারে উপরের দিকে। সন-তারিখ মনে নেই। অবশ্য

ওর জন্ম ১৯২৮ সালে, আমার ১৯৩৬-এ। অনেক ব্যবধান। আবাইয়ের মামাতো এক ভাই পড়ত আমার সঙ্গে। আবাইয়ের অর্থাৎ শহীদ বরকতের মায়ের সঙ্গে তার ছবি আপনারা দেখতে পাবেন বাংলা একাডেমীর সিঁড়ির দেয়ালে যে-সব ছবি ঝুলছে তার একটি কি দুটিতে। আবাইকে তখনি চিনতাম। সে আমার ওই সহপাঠীর সে ফুপাতো ভাই ছিল বলে নয়। অনেক উপরের ক্লাসের ছাত্র সে, এবং কত ছাত্র স্কুলে, আমার তাকে চেনার কথা নয়। কিন্তু সবাই তাকে চিনত, কেবল তাকে নয়, তার ভাইগুলোকেও চিনত। তার কারণ ওরা সব অস্বাভাবিক লম্বা মানুষ ছিল। ওর বাবাকেও দেখেছি। তিনিও ছিলেন অস্বাভাবিক লম্বা। হাটের ভিড়ে পা রাখলে সবার আগে ওঁকেই দেখা যেত। সম্ভবত যে-কোনো দরজায় মাথা হেঁট করে ঢুকতে হতো। অন্তত এই একটা কারণে সবাই ওদের চিনত। আবাইয়ের উচ্চতা দেখে আমরা বিস্মিত হতাম, হয়তো হাসতামও। সেই যে হাসান হাফিজুর রহমান লিখেছেন ঃ

> আবুল বরকত নেই ; সেই অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠা
> বিশাল শরীর বালক, মধুর স্টলের ছাদ ছুঁয়ে হাঁটতো যে
> তাকে ডেকো না ;

বিশাল শরীর বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়, সে মোটা ছিল না, কিন্তু লম্বা ছিল, অস্বাভাবিক।

এখন সেই আবাইয়ের গল্পটা বলি।

ঠেলাঠেলিতে ইতিহাসের চাকা কাদা থেকে উঠেছে। কিন্তু মচকে গেছে। চলছে, কিন্তু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, আর ক্যাঁচর-ক্যাঁচর শব্দ উঠছে। দক্ষিণে কাগ্রামে খুব উল্লাস, হিন্দুস্তান যে হয়ে গেছে মুর্শিদাবাদ। উত্তরে তালিবপুরে গভীর বিষাদের ছায়া, পাকিস্তান যে হলো না মুর্শিদাবাদ।

আবাইয়ের মনেও বড় দুঃখ, চাপা বেদনা। নবাবদের স্থান মুর্শিদাবাদ, মুসলিম কৃষ্টির এক পীঠস্থান মুর্শিদাবাদ, সে পাকিস্তান হলো না? শোনা যায় এক নবাব-পুত্র প্লেন ভাড়া করে উড়ে গিয়েছিলেন করাচি, গিয়ে বলেছিলেন, আপনি এ কী করলেন, জিন্না সাহেব? আগস্টের পরে ক'মাস গেছে, শীত পড়েছে। টেস্ট পরীক্ষা চলছে। শেষদিনের পরীক্ষা। খুব পড়েছে ক'দিন, রাত জেগেছে। শরীরের দীঘল কাঠামোখানায়

মাংস তো খুব নেই, মাথাখানা খুব বড়। সরু গলা বুঝি আরো সরু হয়ে গেছে। মা কইমাছ জোগাড় করে সুন্দর ঝোল রান্না করে রেখেছেন। মা বলেছিলেন, ওরে, পানি গরম করে দি, ঘরে গোসল কর্। শোন্ আবাই, বড় ঠাণ্ডা, পুকুরে যাস না, বাবা।

এমনিতে শান্ত। মনে হয়, নিরীহই বুঝি। কিন্তু মনে যা ভাববে তাই করবে। বলে, না, মা, পড়ে-পড়ে মাথাটা গরম হয়ে আছে। ঠাণ্ডা করে আসি।

গায়ে সরষের তেল মাখল, মাথার চাঁদিতে নারকেল তেল ঘষল। সময় নেই। পুকুর সামান্য দূরে। লম্বা লম্বা পা ফেলে গিয়ে হাপুস-হুপুস ক'টা ডুব দিয়ে উঠে এল। ঠাণ্ডায় শীরর যেন জমে গেল। যাক। মনে হচ্ছে, আমার যত স্মৃতি, যত অনুভব, যত বিদ্যা এবং কল্পনা, একটা বরফের মতো শক্ত প্রকোষ্ঠে এখন বন্দী হয়েছে। পরীক্ষার খাতায় এখন ওদের আমি যেমন খুশি বের করব আর পুতুল-নাচ নাচাব।

কিন্তু খেতে বসে কইমাছ দেখে অমনি হাত গুটিয়ে বসে রইল। বলল, মা, এখন কি আমার কইমাছের কাঁটা বাছার সময় আছে?

মা তাড়াতাড়ি কাছে এসে বসে বললেন, আবাই, তুই ভাতে ঝোল মাখা। কপি-ভাজাটা দিয়ে শুরু কর্। আমি কাঁটা বেছে দিচ্ছি। এক লহমার বেশি লাগবে না।

আবাই হাসল মনে-মনে, আমি এখনো সেই তোমার কোলের খোকাটি আছি! কিন্তু রাগ দেখাল বাইরে। বলল, মা, তোমার ওই কই মাছটাছ আমার ভাল্ লাগে না। আজকে একটা ডিম ভেজে দাও।

'আজকে' বলার কারণ হচ্ছে, সেই যেদিন পরীক্ষা শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই ও ডিম খেতে চাইছে, ডিম খেলে তবু গায়ে একটু বল হয়, চাই কি মাথাও খুলতে পারে, কিন্তু মা কিছুতে দেবেন না। ডিম হলো অপয়া। ডিম খেয়ে পরীক্ষা দিতে গেলে পরীক্ষা খারাপ হয়ে যাবে রে বাবা।

কে বলেছে?

মুরুব্বিরা সব বলেছেন।

আবাই তখন বলেছে, হুঁহ্, মুরুব্বিরা সব বলেছেন! তোমাদের মুরুব্বিরা জীবনে পরীক্ষা দিয়েছেন? সব তো ছিল মূর্খ, পড়েছে আরবী-ফারসী। তারা কী জানবে?

মা বলেছেন, ছি, বাবা, ও-রকম করে বলতে হয় না। তাঁরা অনেক কিছু জানতেন। কোরান হাদিস জানতেন। কোনো ভালো কাজে বেরোলে, ধরু, জমি কিনতে, বা, মামলার দিন পড়েছে, কোর্টে গেলে কখনো ডিম খেয়ে যেতেন না।

আবাই বলেছে, ঠিক আছে, আমাকে দেখাও, কোরান-হাদিস খুলে দেখাও কোথায় লেখা আছে ভালো কাজে বেরোবার সময় ডিম খেতে নাই, তাহলে খাব না।

মা লজ্জায় মুখ নামিয়ে বলেছেন, হ্যাঁ রে, আমি কি অত কোরান হাদিস পড়েছি?

আবাই ততক্ষণে খেতে শুরু করেছে। বলেছে, কেন, ওই যে তোমার ভাইটি রয়েছেন না, পাশের বাড়ি, গ্রামের প্রধান, ওঁকে বলো না দেখাতে।

মা আর কিছু বলেন নি। হাত দিয়ে মাছি তাড়াতে শুরু করেছেন। বলেছেন, খা, বাবা, খা, অত কথা বলে না।

কিন্তু আবাই ডিম ভালোবাসে। ডিম খেতে না পাওয়ার দুঃখ সে ভুলতেই পারছিল না। বলেছে, হ্যাঁ মা, আর তোমার ওই মামলা করতে যাওয়া আর গরিব মানুষের জমি কিনে বেড়ানো, এগুলো বুঝি খুব ভালো কাজ?

তখন মা বলেছেন, হ্যাঁ রে, তোর চোদ্দ পুরুষ কিনে রেখে গিয়েছিল বলেই তো আজ যা হয় চাট্টি খাচ্ছিস।

তখন হঠাৎ আবাই সেই কথাটা বলে ফেলেছে, না মা, আমি পাকিস্তানে চলে যাব।

মা কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছেন। বোকার মতো ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন। তারপর বলেছেন, আবাই, চলেছিস পরীক্ষা দিতে, এখন রাখ তো বাবা ওই-সব অলক্ষুণে কথা।

এ গেল সেই প্রথম পরীক্ষার দিনের কথা। আজ শেষ দিন। আজ কইমাছ দেখে তার মাথা গরম হয়ে গেছে। মাছ যদি খেতেই হয় তো সে পছন্দ করে বোয়াল, আড়, চিংড়ি এইসব। আবার বলে কিনা, কাঁটা বেছে দিই। যাকগে, আজ পরীক্ষা দিয়ে এসে, আসতে আসতে তো সন্ধে হয়ে যাবে, দু'জোড়া ডিমের পোচ দিয়ে সে চা খাবে। না খেলে চলবে কেমন করে? সারা দুনিয়ার লোক তো আমার লম্বা হওয়াটাকে

নজর দিয়ে দিয়ে আমাকে পাট-কাঠির মতো রোগা করে ছাড়ল। ওরা আমার আয়ুটাকেই না শেষ করে দেয়। এখন ডিম-ঘি এইসব ঠিকমতো না খেলে ওই তালগাছের মতো কেবল মাথায় বাড়ব, আড়ে বাড়ব না।

নাকে-মুখে গুঁজে খাওয়া সেরে কাপড় পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে, হাশমতদের বাঁশ-বনের ভেতর দিয়ে একটা সংক্ষেপ পথ রয়েছে, ওই পথ ধরে মাঠে গিয়ে পড়ল। ধানকাটা শুরু হয়েছে। কোনো ক্ষেতে কাটার আগে মই দিয়ে ধানগাছগুলোকে শুইয়ে দেয়া হচ্ছে। কোনো ক্ষেতে কাস্তে চালানোর খস-খস শব্দ উঠেছে। কোনো ক্ষেতে কাটা ধান আঁটি বাঁধা হচ্ছে। একটি ক্ষেতের ধানের আঁটি গরুর গাড়িতেও তোলা হচ্ছে।

তখন চারদিকে তাকিয়ে হঠাৎ চলতে চলতে মনের ভেতর থেকে পরীক্ষার খাতায় লিখতে হতে পারে বলে যে-সব ইতিহাসের সন-তারিখ-গুলোকে আউড়াচ্ছিল, সেগুলো কখন কোথায় পালিয়ে গেছে। হলুদ রোদে দেহের জড়তা কেটে যাচ্ছে। রাত্রের শিশিরবিন্দুগুলি এখনো রয়েছে ঘাসের ডগায়। তার পায়ের স্যাণ্ডেল ভিজে যাচ্ছে। কাটা ধানের ঘ্রাণ উঠছে। তার সামনে আলের ঘাস থেকে মাঝে-মাঝেই গঙ্গা-ফড়িং এদিক ওদিক লাফ দিচ্ছে। দল বেঁধে পায়রারা নেমেছে ধান খুঁটে খেতে। ওই যে একজোড়া ধূসর-রঙের পাখি সুৎ করে গিয়ে না-কাটা ধানের ক্ষেতে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল, ও কী পাখি? মাঠ-ভর্তি রোদে-পোড়া শিশিরের এত কেন গন্ধ?

পাকিস্তান। হ্যাঁ, পাকিস্তান শব্দটা ক'দিন হলো মাথার ভেতর ঢুকে বসেছে। হাশমতের বড়-ভাইটা তার চাচাকে নিয়ে পাকিস্তানে গেল। ওখানে সব ব্যবস্থা করে তারপর সবাই মিলে চলে যাবে।

আবাইয়ের মাথায়ও ঢুকেছে চিন্তাটা। পাকিস্তান হলো গিয়ে সেই স্বপ্নের দেশ যে স্বপ্নটাকে এ-দেশে তার হাত থেকে হঠাৎ কেড়ে নেয়া হয়েছে। সে আগে ভাবতে পারত না এমন হয়, এক মাটির স্বপ্নের তরু অন্য মাটিতে তুলে নিয়ে গিয়ে রোপণ করা যায়। এ কী কাণ্ড ঘটে গেল? সে কী করবে? যাবে পাকিস্তানে? হ্যাঁ, যাবেই তো। কেন যাবে না?

কিন্তু হঠাৎ এই শীতের সকালের মাঠে চারদিকে তাকিয়ে তার মনটা বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল। ওই যে দুটো পাখি সুৎ করে ধানের ক্ষেতে লুকিয়ে পড়ল, মনে হলো ওরাই যেন আমি। কার ভয়ে আমি ওইরকম সুৎ করে লুকিয়ে পড়তে চাইছি? এ না আমার জন্মভূমি? এই পথে না আমি হাজারবার হেঁটেছি? আমার বাবার কবর না এখানে আছে? আচ্ছা, ওই যে লোকগুলো মাঠে কাজ করছে, ওরা সব কী ভাবে?

আবাইয়ের হাতে সময় নেই। না হলে ওদের জিজ্ঞেস করে দেখত, ওরা কী বলে? ওরা পাকিস্তানের কথা কি ভাবে? সেখানে কি যাবে? যদি যায় কেন যাবে? যদি না যায় কেনই বা না যাবে?

কখনো ধান-তুলে-নেয়া ক্ষেতের উপর দিয়ে কোনাকুনি হাঁটছিল, কখনো আল ধরে সোজা হাঁটছিল। ধানের নাড়া খস-খস করে পায়ে লাগছিল। জেলাবোর্ডের রাস্তাটা যেখানে তালিবপুরে ঢুকে নহলার আমবাগানের পাশ ঘেঁষে চলে গেছে, কোনাকুনি ওই আমবাগানে গিয়ে ও উঠবে। বাবলা থেকে বেরোলে তালিবপুর গ্রামের ওই সূচনাটাকে বড় সুন্দর দেখায়। দূর থেকে আম আর বাবলাগাছগুলোকে দেখলে মনে হয় ওরা সুন্দর-জামা-পরা ওই গ্রামের প্রতিহারী। প্রতিহারী হলে কী হবে, ওরা যে-কাউকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নহলার আমবাগানে গিয়ে উঠল। সুন্দর বৃহৎ বাগানটি। এককালে কোনো বড়লোকের ছিল, এখন একালের এক রাজপুরুষের হাতে চলে এসেছে, তিনি আবার আগস্টের পরে-পরেই ঢাকা চলে গেছেন। এখন এই বাগানের কী হবে? মুর্শিদাবাদে যতপ্রকারের আম হয় সব নমুনা নাকি এই বাগানে আছে। মধ্যখানে বৃহৎ গভীর পুকুর। ওখানে নাকি বৃহৎ প্রাচীন সব মাছ আছে যাদের কারো-কারো ওজন আধ মণ হবে।

এখন তো দেশ ভাগ হয়ে গেছে, পাকিস্তান হয়েছে। যিনি ছিলেন মালিক, সপরিবারে চলে গেছেন ঢাকা। এখন এই বাগানের কী হবে? আবাইয়ের আর কাজ নেই, দিতে চলেছে টেস্ট পরীক্ষা, ওই কথা ভাবছে। শির-শির করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। দেখল, আম গাছের পাতাগুলো সেই হাওয়ায় হাসছে। ওই হাসির অর্থ ও স্পষ্ট বুঝল। ওরা বলছে,

কেন গো, এ আবার কেমন-প্রকার প্রশ্ন তোমার? আমরা এখানে ছিলাম, এখানে আছি, এখানে থাকব। তুমি জানো না মানুষের চেয়ে, মানুষের বুদ্ধি কিংবা বিবেকের চেয়ে, মানুষের রাজনীতির চেয়ে গাছের বয়স বেশি? মাটির বয়স, পানির বয়স, ওই যে দেখছ টলটলে কালো জলের পুকুর যাতে আমরা আমাদের মুখ দেখি, ওতে রয়েছে যে-সব মাছ তাদের বয়স, ওই যে মাথার উপর উড়ছে সব চিল, এই যে আমাদের গায়ে ঠোকর মারছে কাঠ-ঠোকরা, কত কীট-পতঙ্গ আমাদের কোটরে কোটরে বাসা বেঁধে আছে, এদের বয়স মানুষের চেয়ে বেশি? তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও, আমরা আছি, থাকব।

দেখল, তাদের গ্রামের আরো দুটো ছেলে ওই যে আগে-আগে আম-বাগান ছেড়ে পথে নামল। ও পেছন থেকে ডাকল, মানু, লিয়াকত।

ওরা দাঁড়ালে গিয়ে ধরল। মানুর বাবা রেলে কাজ করেন, এখন আছেন খড়গপুরে। আবাই জিজ্ঞেস করল, কী মানু, তোমার আব্বা পাকিস্তান যাচ্ছেন না?

মানু বলল, আব্বা তো যেতে চান, আমারও ইচ্ছা যাওয়ার, আরে, বলো কেন, মা-কে নিয়ে হয়েছে ল্যাঠা। ওঁর যে রয়েছে এখানে সাত-গুষ্টি, কিছুতে যেতে রাজি হচ্ছেন না।

লিয়াকতের বাবা মোল্লা মানুষ। তিনি গ্রামের ছোট মসজিদটির ইমাম। লিয়াকত বলল, আরে, আমার আব্বা তো পাকিস্তানের নাম শুনতেই পারেন না?

আবাই বলল, তোমাদের দেখি উল্টো ব্যাপার। আরে, মৌলভী সাহেবরাই তো পাকিস্তান করলেন।

লিয়াকত বলল, না, আব্বা বলেন, পাকিস্তান সৃষ্টি করে আল্লার দুনিয়াকে ওরা ছোট করে দিয়েছে। ইসলাম ছিল সারা হিন্দুস্তানে, এখন তাকে খেদিয়ে দিয়ে দিয়ে ঢোকানো হলো পাকিস্তানের খোঁয়াড়ে। আব্বা বলেন, জিন্না আবার মুসলমান নাকি যে মুসলমানের দেশ গড়বে?

মানু বলল, আরে, তোর আব্বা দেখি মওলানা আজাদের চেলা। শোন্ বাপু, আমি বলি, পাকিস্তান ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

আবাই পরীক্ষা দিয়ে যখন শেষ বিকেলে ফিরছিল, দেখে, হিন্দুদের মেয়েরাও সার বেঁধে নহলার আমবাগানে নামছে। সায়াহ্নের কোমল

ছায়ায় মেয়েরা কোমল পায়ে এই রকম সার বেঁধে আমবাগানের গভীরতর ছায়ায় গিয়ে প্রবেশ করলে আমাদের বাংলাভাষায় তাকে কী বলে কে জানে। রবীন্দ্রনাথ বলাকার কথা বলেছেন। বলাকা ওড়ে আকাশে। এদের যদি আমি, ধরো, ললাকা বলি, কেউ কি আমাকে বড্ড বেশি ঠাট্টা করবে? কেন, ললনা থেকে ললাকা হয় না?

মেয়েগুলির কয়েকজনের চিবুক পর্যন্ত ঘোমটা। কিন্তু ঘোমটা টানলেই যে দেহের ঢেউ স্তব্ধ হয়ে যাবে এমন কোনো কথা নেই। এই ঘোমটাবতীরা হচ্ছে অন্য গাঁয়ের মেয়ে, এই গাঁয়ে বউ হয়ে এসেছে। আর যারা এই গাঁয়ের মেয়ে, অনূঢ়া কি বাপের বাড়ি বেড়াতে আসা, তাদের ঘোমটার বালাই নেই, বরং যত্ন-করে বাঁধা খোঁপাগুলোকে যেন তারা দেখার জন্যেই মেলে ধরেছে, যেমন করে বেদে ঢাকনা খুলে তার ভুজঙ্গের ঝাঁপি মেলে ধরে। আবাই একজনকে চিনল। পাঠশালায় একসঙ্গে পড়ত। বুকের ভেতরটায় তার কেমন মায়া ছলছল করে উঠল। কোথায় কোন্ গ্রামে কার ঘরের বউ হয়ে চলে গেছে কে জানে। সিঁথিতে সিঁদুর বড় বেশি জ্বলজ্বল করছে। অল্প-বয়েসি বিধবাও দুএক-জন আছে, ওদের অঙ্গের থান দেখলে বোঝা যায়। ওই ললাকার আসল কৃত্য কী আবাই জানে। কিন্তু কয়েকজনের কাঁখে পিতলের ঝকঝকে কলসিও আছে। যাওয়ার বেলা ওই পুকুর থেকে জল ভরে নিয়ে যাবে।

কিন্তু আবাই ততক্ষণে অন্য কথা ভাবছে। হায়, আমি দেশান্তরি হব? এই এরা থাকবে, আমি চলে যাব? আমি কে? ওরা কারা? আমি মুসলমান। ওরা হিন্দু। পৃথিবীতে কেউ মুসলমান, কেউ হিন্দু এ তো হবেই। পৃথিবীতে নানা-কিছু আছে। হিন্দু মুসলমান আছে, আকাশ আছে, মাটি আছে, আলো আছে, হাওয়া আছে, নিসর্গ আছে। কেন, মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর। ওই যে বলাকার মতো ললাকা গজেন্দ্রগমনে গিয়ে মিলিয়ে গেল নহলা বাগানের গাছের আড়ালে, আমি কবি হলে বলতাম, ওও নিসর্গের অংশ। হায় ভাগ্য, হায় রাজনীতি, আমার পরিচিত নিসর্গ থেকে যাবে, আমি থাকব না।

আবাই বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে নহলার বাগান থেকে মাঠে নামল। ওই ওদিকে ওদের গ্রাম বাবলার কোল জুড়ে কেবল আমনের জমি। বছরে ওই এক ফসল আমনই হয়। পূর্বে-পশ্চিমে এত বড় যে মাঠ

সব এক-ফসলি জমি, কারণ নির্ভর সেই বর্ষার বৃষ্টি। কিন্তু এখানে অনেকখানি জমিতে রবি-ফসলের আবাদ হয়েছে। সড়কের তলা দিয়ে একটা নালা চলে এসেছে এইদিকে। ফুটবল-মাঠের পাশে রয়েছে সেচের বড় পুকুরটি। ওখান থেকে দোন দিয়ে পানি তুলে পাঠানো হচ্ছে এই নালা দিয়ে। তাতেই অনেকগুলো জমি সবুজ হয়ে উঠেছে, চোখ জুড়িয়ে যায়। রয়েছে আলু, ছোলা, সরষে। আর সব ক্ষেতেরই এখানে-ওখানে থোক-থোক ধনে-পাতা।

ছোলার ঝাড়গুলো দেখে লোভ হচ্ছিল। একমুঠো উপড়ে নিতে ইচ্ছে করছে। শক্ত খোলের মধ্যে রয়েছে সব ছোলার নরম সবুজ দানা। দাঁত দিয়ে খোলা ভাঙলে ঠোঁটে টক স্বাদ লাগে। বেশ লাগে। কিন্তু পরের জমি। অদূরে লোকজনও রয়েছে, ক্ষেতে কাজ করছে। লোভ সামলে এগিয়ে যায়।

তখন দেখে একটা আলু আর একটা ছোলার ক্ষেতে পাশাপাশি কাজ করছে ওদের গাঁয়েরই ক'জন লোক। এদের কেউ মুনিষ অর্থাৎ ক্ষেত-মজুর, কেউ বর্গাদার অর্থাৎ ভাগে ভদ্রলোকের জমি চাষ করে। ওদেরই একজন গলা চড়িয়ে বলে উঠল, কী গো, আবাই মিয়া, এতক্ষণে আপনার ইশকুল শেষ হলো?

আবাই দাঁড়াল। বলল, হ্যাঁ। আজ টেস্ট পরীক্ষা শেষ হলো। এবার ম্যাটরিক দেব কিনা। তোমরা দোয়া কোরো, বুঝলে, রমাই-চাচা?

রমাই-চাচা লোকটা আধ-বুড়ো। পাতলা ছিপছিপে দেহ, কাঁচা-পাকা ছুঁচলো খানিকটা দাড়ি রয়েছে। বলল, আরে, বড়-মিয়া, সে-কথা বলতে হবে? দোয়া আমরা সব সময় করি। কিন্তু হ্যাঁ, বুঝলেন কিনা, একটা আবদার আছে।

কী?

খালি ম্যাটরিক পাশ দিলে চলবে না, হ্যাঁ, বি-এ পাশ দিতে হবে। ওই যে কাগ্রাম, তালিবপুর, ঘরে-ঘরে কত আই-এ বি-এ পাশ। আমাদের বাবলা গাঁয়েরও নাম ছড়িয়ে দিতে হবে।

তখন আবাই বলল, ও রমাই-চাচা, এদিকে যে পাকিস্তান হয়ে গেল গো! মুসলমানের দেশ পাকিস্তান!

রমাই-চাচা উঠে দাঁড়াল। কোমরে রয়েছে কেবল নেংটিটি। একটা গামছা জড়ানো ছিল কোমরে। সেটি খুলে গায়ে জড়াল। ঠাণ্ডাটা বুঝি এতক্ষণে টের পেয়েছে। সে বলল, মুসলমানের দেশ পাকিস্তান?

আবাই বলল, হ্যাঁ।

রমাই চাচা জিজ্ঞেস করল, শুনেছি তো আমরাও, কিন্তু সেটা কোন্ দিকে বলেন দেখি আবাই মিয়া?

খানিকটা আছে আমাদের এই পুবদিকে, আর খানিকটা আছে পশ্চিমে, অনেক দূরে।

রমাই-চাচা আবার জিজ্ঞেস করল, গঙ্গাপারের ওই দিকে নাকি?

আবাই বলল, না, ঠিক গঙ্গা না, গঙ্গা তো গেছে মুর্শিদাবাদের মাঝ-খান দিয়ে। পদ্মার ওই পারে।

রমাই-চাচা বলল, ওই হলো একই কথা।

আবাই বলল, কিন্তু আমাদের এই দেশ হয়ে গেল হিন্দুস্থান। হিন্দুর দেশ হিন্দুস্থান।

রমাই-চাচা বলল, হিন্দুর দেশ হিন্দুস্থান?

হ্যাঁ।

কেন গো, এ-দেশে মুসলমান থাকেবে না? মুসলমান যাবে কোথা? আমাদের বাবলায় হিন্দুই নাই, সব মুসলমান. তারা সব যাবে কোথা?

আবাই বলল, যে থাকতে চায় সে হিন্দুস্থানে থাকবে, যে যেতে চায় সে পাকিস্তানে যাবে।

রমাই-চাচা বলল, বেশ, তাহলে তো ভালো কথা।

আবাই জিজ্ঞেস করল, তোমরা কী করবে বলো দেখি, চাচা?

রমাই-চাচা বলল, না, বাপু, আমরা কোথাও যাব না।

কিন্তু আমরা যে যাওয়ার কথা ভাবছি।

রমাই-চাচা অবাক হয়ে বলল, বলেন কী গো, আবাই-মিয়া?

আবাই বলল, হ্যাঁ। কী করব বলো। কষ্ট করে লেখাপড়া করছি। এখানে চাকরি জুটব না।

রমাই-চাচা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলল, হায় রে খোদা, কী জমানা পড়ল।

আবাই বলল, ও চাচা, কিন্তু পাকিস্তান তোমরা যাবে না কেন? সেটা মুসলমানের দেশ না?

তখন কুদ্দুস উঠে দাঁড়াল। বলল, ও আবাই-মিয়া, আমরা কি চাকরি করি, না জমিদারি করি যে পাকিস্তানে যাব? যে যাবে সে যাবে, এই জমি কি পাকিস্তানে যাবে?

সে হঠাৎ হেঁট হয়ে আলুর কেয়ারি থেকে একমুঠো ঝুরো মাটি তুলে দেখাল, তারপর সেগুলা ফেলে দিয়ে পাছার গামছায় হাত মুছল। বলল, এই মাটি পাকিস্তানে যাবে?

আবাই বলল, আচ্ছা, চলি।

বলে' সে চলে এল।

আবাইয়ের বুকের ভেতর দ্বন্দ্ব চলল, চলতে থাকল। পাকিস্তান যাবে কি যাবে না। নিজের সঙ্গে নিজের তর্ক হয়। কখনো পাকিস্তান জেতে, কখনো হিন্দুস্থান। যখন হিন্দুস্থান জেতে তখন সেটাকে সে আর হিন্দুস্থান বলে না, বলে, স্বদেশ। ওই স্বদেশপ্রেম তার মাঝে-মাঝে বড় প্রবল হয়ে ওঠে। সবচেয়ে বড় কথাটা হচ্ছে, মা হন না রাজি। মূর্খ মানুষ, হায়, তিনি পাকিস্তন ব্যাপারটার মানেই বুঝতে পারেন না।

আবাইয়ের ম্যাটরিক পরীক্ষা হয়ে যায়। পাশ করে। বলে, মা, এখনো সময় আছে, বলো পাকিস্তানে যাই।

মা বলেন, না।

ম্যাটরিক পাশ বলে কথা। বড় উৎক্রান্তি। ভাইগুলোকে ডেকে সে ভোট লাগিয়ে দেয়। বল্লে, বল্ কে কোন্ দিকে? পাকিস্তানে যাবি, না হিন্দুস্থানে পড়ে থাকবি?

পাকিস্তান জেতে। কিন্তু তবু মা বলেন, না। বলেন, হ্যাঁ রে বাপ, হিন্দুদের সঙ্গে বলছিস বিনিময় করবি। আমার এইসব ঘর-বাড়িতে এসে তারা ঠউবে, কোথাকার কোন্ দেশের মানুষ, হিন্দু, আচ্ছা, না হয় উঠল, না হয় হলো হিন্দু, হিন্দুরাও মানুষ, আল্লাই তাদের বানিয়েছেন, তোর চোদ্দ-পুরুষের কবর আছে কবরস্তানে, তারা হয়তো সেগুলোর বেইজ্জতি করবে, হ্যাঁ রে বাপ, পাকিস্তানে গিয়ে সুখী হতে পারবি? তোদের উপর তাঁদের লা'নৎ পড়বে না? বল্?

আবাই তখন বহরমপুরে গিয়ে কলেজে ভর্তি হয়।

আবইয়ের দুই মামা। এই বাবলাতেই তাঁদের বাড়ি। বড়-মামা বড় অফিসার। তিনি প্রথমে একটু অন্যরকম ভেবেছিলেন, আহা, চোদ্দ-পুরুষের ভিটে, জমি-জিরেত, আত্মীয়-পরিজন, চেনাজানা মানুষ, সব ফেলে যাওয়া। কিন্তু তারপর হঠাৎ মন শক্ত করে চলে গিয়ে ওখানে ঢাকায় বড় চাকরিতে ঢুকে পড়লেন। তাঁর বড় ছেলেটাও গেল প্রথমে, তারপর আর সবাই গেল। ওদিকে ঢাকায় আটচল্লিশ সালে হলো ভাষা আন্দোলন,। ওর সেই মামাতো ভাই খুব একখানা বাংলাভাষার আবেগ আর দরদ-মাখানো চিঠি লিখেছিল আবাইকে। আবাই সেই চিঠি পড়ে কেমন একরকম করে হাসল। বলল, আরে দূর, এক বাংলা থেকে যাব আর-এক বাংলায়। আরে, কিসের তোমার ভারত-পাকিস্তান। আমি ভারতে থাকলেই কি ভারতীয় নাকি? আর পাকিস্তানে গেলেই কি পাকিস্তানী নাকি? ইদানীং কলেজে ভর্তি হয়ে সে রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রতি কিঞ্চিৎ আগ্রহী হয়েছে। স্বপ্ন দেখছে, রাষ্ট্রতত্ত্বে আনার্স পড়বে, এম, এ, পড়বে। সে বলে, এখন জাতিতত্ত্বের মীমাংসা কে করে দেবে দাও। পাকিস্তান যদি মুসলমান রাষ্ট্র হয়, ইসলামে তো জাতিতত্ত্ব নাই। মুসলমান হচ্ছে বিশ্ব-নিখিল জাতি। তাহলে লাহোর প্রস্তাবের আন্দোলন একটা শুরু হতে ওখানে বাধ্য।

আই-এ পরীক্ষা দিয়ে মা-কে বলল, মা, তুমি কি ভেবেছ পাকিস্তান খুব দূরে? এই তো রাজশাহী। একবার ঘুরে আসি। তুমি থাকো।

ঘুরে আসতে গিয়ে সে ঢাকার মায়ায় জড়িয়ে গেল। ফরিদপুর থেকে কই আসে এই এত বড়-বড় ঢাকার বাজারে। ভাবে এই কইমাছকে কত ভয় করতাম এই সেদিনও। কিন্তু কই মাছকে চুষে-চিবিয়ে খেতে জানতে হয়। ওর ভাইগুলোও এক এক করে ঢাকা এসেছিল। মা সেই বাবলার পল্লীতে বসে ধূসর চোখে সন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোরা সুখে থাক্, বাছারা।

যখন উনিশশ' বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলের বারান্দায় পুলিশের রাইফেলের গুলী ওকে আঘাত করেছিল, একটু কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু এখন সে সুখেই আছে। না, আজিমপুরের কবরে নয়, বাংলার মানুষের হৃদয়ে, তাদের বিবেকে, স্মৃতিতে আর কল্পনায়।

ছেঁড়া তার

মাহমুদুল হক

কিছুকাল যাবৎ পায়ে হাঁটার চক্করে প'ড়ে পথেঘাটে বেশ অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়ে যাচ্ছে। অন্তত বিশ-তিরিশ বছরের মধ্যেও যাদের সঙ্গে কোনো রকমের দেখা-সাক্ষাৎ কিংবা যোগাযোগ ঘটেনি দেখা হচ্ছে এমন অনেকের সঙ্গেই।

হৃদযন্ত্রে বিরাট রকমের একটা গোলযোগ দেখা দেবার পর থেকে আমাকে ডাক্তারের নির্দেশে মাইল চারেকের মতো হাঁটতে হয় রোজ। হাঁটার জন্যে আমি নির্দিষ্ট সময় বেছে নিয়েছি দু'টো; এক ভোরে, দুই অপিস ক'রে ফেরার পথে।

এই অপিস থেকে ফেরার পথেই নজরুলের সঙ্গে দেখা।

রমনা পার্কের পাশে সেগুন গাছ কাটার উৎসব চলছিলো ধুমসে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে হা ক'রে দেখছিল নজরুল। এক একটা মোটা ডাল কাছি বেঁধে টেনে টেনে নামানো হচ্ছিলো রাস্তার একপাশে, সে দাঁড়িয়েছিল রাস্তার অপর পারে। আপন মনে সে ব'লে উঠলো 'খুব ভালো', তারপর হাঁটতে শুরু ক'রে দিল।

মুখ দেখে কেমন যেন চেনা মনে হচ্ছিলো; হাঁটা দেখেই মনে পড়লো, আরে এ তো আমাদের সেই নজরুল।

বললাম, 'নজরুল নাকি?'

'কিন্তু আপনি?'

'চেষ্টা ক'রে দ্যাখো দিকি চেনা যায় কি না—'

'তুমি না মকবুল?'

কতোদিন পর দেখা!'

'তা ঠিক।' নজরুল বললে, 'কিন্তু তোমাকে চেনা সত্যিই খুব কঠিন ব্যাপার। এই নাদুস-নুদুস চেহারা দেখে ভাবাই যায় না ছেলেরা তোমার নাম দিয়েছিলো চিকাজিন্না। আর মেজাজ তো তোমার ছিলো জিন্নার মতো খিটখিটে—'

'তোমার দেখছি সব মনে আছে—'

'থাকবে না কেন, সারা বছরই তুমি ডিসেন্ট্রিতে ভুগতে, থানকুনি পাতা আর সিঙ্গিমাছের ঝোল এই ছিলো তোমার বাঁধাগতের পথ্য। তোমার মা প্রায়ই আমাকে বলতেন, নজরুল কি সুন্দর মজবুত তোমার স্বাস্থ্য, আমার মকবুলটা একেবারে হাড় জিরজিরে, ওকে তোমরা একটু দৌড়ঝাঁপ করিয়ো, কুড়ের বাদশা ওটা, রাতে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোয়। তা, বেঁচে আছেন তোমার মা?'

'অনেক আগেই মারা গেছেন—'

'আমাকে খুব ভালোবাসতেন, তাঁর মুখ এখনো আমার পষ্ট মনে আছে—'

কিছুক্ষণ কথা হলো না। নীরবে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম আমরা। আগের মতোই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল নজরুল।

বললাম, 'পা-টা আর ভালো হলো না শেষ পর্যন্ত—'

'হ'লো আর কই—'

'সামান্য একটু ভুলের জন্যে জীবনভর এমনি ক'রে—' বাধা দিয়ে নজরুল বললে, 'ভুলের জন্যে মানে?'

আমি বিব্রত হয়ে বললাম, 'ভুলের জন্যে মানে এই একটু অসাবধানতার জন্যে কি খেসারতটাই না তোমাকে দিতে হলো।'

'কাউকে না কাউকে তো দিতে হয়ই!'

'তা ঠিক!'

'আমার সঙ্গে হাঁটতে তোমার খারাপ লাগছে?'

আমি হেসে বললাম, 'এখনো তুমি সেই আগের মতোই এ্যারোগ্যান্ট—' নজরুল হেঁসে বললে, 'তুমি শালা দক্ষ অভিনেতা, ঘচাং ক'রে সুর পাল্টে দিলে। ছেলেমেয়ে ক'টি?'

'তিনটি। দু'টি ছেলে একটি মেয়ে—'

'কি নাম রেখেছ ছেলেমেয়েদের?'

'ছেলে দুটির নাম আদিল আর গউস, মেয়েটির নাম ইসমত—'

নজরুল হো হো ক'রে হেসে বললে, 'হাবিল-কাবিল রাখলেই পারতে। তা বেশ, দুটি পাতা একটি কুঁড়ি—'

গায়ে না মেখে আমি বললাম, 'তোমার ছেলেমেয়ে?'

'বউই নেই, ছেলেমেয়ে পাবো কোত্থেকে?'

'তাহলে বিয়েই করোনি এখনো?'

'হয়েছিল একটা, মাসখানেক না হতেই সে বেচারী সরে পড়ে—'

'কারণ?'

'কি ক'রে বলবো, সে তো আর কিছু ব'লে যায়নি—'

'তারপর বোধহয় আর কোনো চেষ্টা করোনি?'

'কি লাভ!'

'তা বটে—'

'জীবন তো কেটে যাচ্ছে—'

'আছো কোথায়, মানে কি করছো এখন?'

'গাঁয়ের কলেজে মাস্টারী।'

'একা একা অসুবিধে হয় না কোনো রকম?'

'মানে জৈবিক অসুবিধে তো?'

'ধরো তাই—'

'এখন আর খুব একটা হয় না। গোড়খাওয়া রাঁধুনি আছে একজন, সাধ্যমতো সে-ই দ্যাখে। তার মেয়ের বিয়েতে কিছু নগদ টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছিলাম, হয়তো সেজন্যেই চেষ্টা করে একটু মন জুগিয়ে চলবার। হাজার হোক মানুষ তো, কৃতজ্ঞতাবোধ অল্পবিস্তর থাকেই—'

'রুচিতে বাধে না?'

'রুচিফুচির কথা কখনো ভেবে দেখিনি; অবশ্য বিয়ে করার সময়ে আমি নিজেই মেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম, যদ্দুর মনে পড়ে প্রশ্নও করেছিলাম দু' একটি!'

একটু একটু ক'রে নিস্তেজ হয়ে আসছে বিকেল। অনেকক্ষণ কোনো কথা হয় না। নিঃশব্দে হাঁটতে থাকি দু'জন।

এক সময় বললাম 'তোমার মনে আছে মজরুল, সেইসব দিনের কথা?'

'কোন সব?'

'তখন আজকেরা এই ধানমণ্ডি গজিয়ে ওঠেনি। কবিরাজের সেই বাগান। তুমি আর আমি পেয়ারা গাছের ছায়ায় সেই ধ্বসে পড়া মাটির

টিপির ওপর শুয়ে শুয়ে কবিতা পড়তাম সারাদিনভর। ছাগলের মতো আমরা আমাকে চিবাতাম। দু একদিন তুমি সূর্যসেনের অভিনয় করতে। পিছনে হাত বেঁধে গম্ভীরমুখে পায়চারী করতে আর বলতে, 'দেশমাতৃকা—'

'বোধ হয় এই রকমই একটা কিছু হতো—'

'মাঝে মাঝে মাটিতে হাঁটু গেড়ে ব'সে বলতে দেশমাতৃকা, তুমি আমাকে শক্তি দাও। আমি একদিন কেঁদে ফেলেছিলাম মনে আছে তোমার?'

'মনে আছে।'

'ঠিক অমনি ক'রে আরো একদিন কেঁদে ফেলেছিলাম, একাত্তুরের ছাব্বিশে মার্চ, রেডিয়োতে আমার সোনার বাংলা তোমায় ভালোবাসি শুনে, মনে হয়েছিলো তোমার সেই দেশমাতৃকার মুখ এমন করুণ এমন দুঃখিনীর যে বুক হাহাকার করে, সেদিনও তোমার কথা মনে হয়েছিলো—'

নজরুল হেসে বললে, 'একদিন সবই গল্প হয়ে যায়। আমার তো মনে হয়, কিছু লোক শুধু কষ্ট পাবার জন্যেই জন্মায়—'

"বুঝতে পারছিলাম ভাবাবেগে একটু একটু ক'রে তরল হয়ে পড়ছি আমরা উভয়েই। নজরুলের চোখেমুখে এক অদ্ভুত শ্রান্তির ছাপ, সে যেন জোর ক'রে নিজেকে বয়ে বেড়াচ্ছে, হাত-পা তার বাঁধা, জীবনের অকথ্য গ্লানিকে সে প্রতি মুহূর্তেই মাছির মতো তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

আমি বললাম, 'স্পষ্ট মনে আছে আমার সেদিনকার সব কথাও, বিশে ফেব্রুয়ারীর সেই ভোরবেলা, সারারাত চুপি চুপি পোস্টার মেরে বেড়ালাম দু'জন, ভোরবেলা আজাদ অপিসের পেছনে তুমি লালবাগের গুণ্ডাদের হাতে ধরা পড়লে। আমি ছুটে পালিয়ে গেলাম, কি মনে করে তুমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলে। কি মারটাই না মারলো তোমাকে ওরা সবাই, তোমার মাথা ফাটিয়ে দিলো, মুচড়ে ভেঙে দিলো পা, দূরে পাঁচীলের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি তোমার চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম—'

নজরুল বললে, 'একটুও দয়ামায়া ছিলো না ওদের, তা না হলে ভেবে দ্যাখো, কতোই বা আমার বয়েস তখন, আর ওরা সবকটা ছিলো ইয়া তাগড়াই এক একটা ধেড়ে—'

আমি বললাম, 'কিন্তু তুমি অমন করলে কেন, ইচ্ছে থাকলে তুমি ছুটে পালাতে পারতে। কেন যে জিদ ধ'রে অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে আজো আমার মাথায় তা আসে না—'

নজরুল বললে, 'তা ঠিক, পালানোই ঠিক ছিল, ওই মুহূর্তে আমার মাথায় কেন যেন বুদ্ধিটা খোলেনি, নিছক গোঁয়ার্তুমি। তখন মনে হয়েছিল পালাবো কেন, আমি তো আর কোনো অন্যায় করিনি। তাছাড়া আমার ভয় ছিলো কেবল পুলিশ নিয়ে। পুলিশের ব্যাপারে আমি সতর্ক ছিলাম, সাধারণ মানুষের হাতে প'ড়ে এমন মার খাবো কল্পনাও করিনি। বোধহয় মেরেই ফেলতো সেদিন—'

আমি নজরুলের মুখের দিকে তাকালাম, এই মুহূর্তে তার গলার স্বর বিদঘুটে রকমের ঘড়ঘড়ে। যেন বহুকাল থেকে রোগে ভুগছে। সে বললে, 'এসব যাক, খুব একটা ভালো লাগে না, এখন বড়ো তেতো মনে হয়। জেবু, মানে যে মেয়েটিকে আমি বিয়ে করেছিলাম, প্রায় প্রতিদিনই সে আমার পা ভাঙার গপ্পো শুনতে চাইতো, একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানানভাবে তার কাছে বলতে হতো। যা বলতাম, যেভাবে ওকে বুঝ দেবার চেষ্টা করতাম খুবসম্ভব ওর তা বিশ্বাস হতো না। একদিন তো ঠাট্টা ক'রে বলেই ফেললে, মুরগী চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়োনি তো, যদিও জানতাম নিছক ঠাট্টার কথা, তবু কেন যেন আমার মাথায় রক্ত চ'ড়ে গিয়েছিল, ওর থতোমতো খেয়ে যাওয়া দেখে বুঝতে পারলাম আমার চেহারা নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর হয়ে গিয়েছে—'

'তারপর?'

'তারপর আর কি, নিজেকে সামলে নিলাম, খুব বেশি একটা দোষ দেওয়া যায়কি ওবেচারীকে, ছাত্ররা তো আগে থেকেই নাম দিয়ে রেখেছে ল্যাংড়া নজরুল, ওকেও আড়ালে-আবডালে ল্যাংড়া নজরুলের বউ বলে ডাকা শুরু করেছিলো অনেকে—'

আমি বললাম, 'সেই যে সেদিন তোমাকে রেখে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম, তুমি নিশ্চয়ই—'

'মাথা খারাপ নাকি তোমার? মনে করবো কেন, তুমি ঠিকই করেছিলে। আমার চেয়ে তুমি সব সময়ই ভয়কাতুরে ছিলে, তোমার তো পালাবার কথাই। পালাতে পারলে তো রেহাই পেয়ে যেতাম আমিও।

আসলে আমি যাকে সাহস দেখানোর মতো একটা কিছু ভেবেছিলাম, সেটা ছিলো নিছক গাণ্ডুমি— আমি গাণ্ডুর মতো ঠায় দাঁড়িয়ে মার খেয়েছিলাম। ভয় তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলো, সাহস আমাকে আচ্ছামতো জব্দ ক'রে ছেড়েছে—'

'কথাটা মনে পড়লেই আমার খুব খারাপ লাগে—'

'আসলে ভুলটা ছিল একা আমার, উচিত ছিলো আমার ছুটে আত্ম-রক্ষা করার, যখন বুঝলাম তখন ওরা আমাকে কব্জা ক'রে ফেলেছে, দেরি হয়ে গেছে অনেক—'

সন্ধ্যা না গড়াতেই মাঝ রাস্তার বিজ্ঞাপনগুলো টিপটিপ ক'রে জ্বলে উঠেছে।

'বেশ সাজিয়েছ তোমরা শহরকে, মনে হয় গহনা পরে আছে, ভালোই লাগে—' নজরুল বললে, 'ফন্দিটা মন্দ নয়, সাজানোও হলো, কিছু আয়ের পথও খোলা হলো।'

হঠাৎ হাঁটা বন্ধ ক'রে একটা বিজ্ঞাপনের দিকে আঙুল তুলে সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। বললে, 'পড়ে দ্যাখো বিজ্ঞাপনটি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বানানটাই ভুল, আচ্ছা কি বলতে ইচ্ছে করে ওদের—'

আমি দেখলাম, ঠিকই মন্ত্রণালয় বানানে ভুল আছে, নজরুল ঠিকই ধরেছে।

'শোভার ভেতরে এমন কীট, রাখো শালা, শোভা দেখাচ্ছি—' এই ব'লে একটা আদলা ইট রাস্তার পাশ থেকে তুলে নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে মারলো সে ঝুলন্ত 'মন্ত্রণালয়ের' গায়ে এবং পরক্ষণেই ঝনঝনিয়ে সেটা ভেঙে পড়লো।

বললাম, 'একি নজরুল, একি করলে—!'

হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে, 'ভুল দেখলে আমার মাথায় রক্ত চ'ড়ে যায়। মনে হয় বোমা মেরে মেরে এক একটা ভুল ঠিক এইভাবে উড়িয়ে দিই—'

মীর আজিমের দুর্দিন

সেলিনা হোসেন

মীর আজিমের কতগুলো নিজস্ব ব্যাপারস্যাপার আছে। সেই ব্যাপার-স্যাপারের মধ্যেই তার ঘেরাটোপ বাসাবাড়ি। তার বাইরে সে খুব একটা যায় না। গুটিয়ে থাকতে দারুণ ভালোবাসে। এ পর্যন্ত সেভাবেই থেকে এসেছে। কিন্তু এখন আর পারে না। দারুণ আক্রোশ তড়বড়িয়ে বাড়ে। সেটা ক্রমাগত বিশাল হয়। বিশাল হতে হতে একসময় মীর আজিম বুক থাবলে ধরে। তখন ভীষণ কষ্ট হয়। এই কষ্টটা মীর আজিমের নিজস্ব নিয়মগুলির মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকে। যখন তখন আঁচড় কাটে।

সকলের বিরুদ্ধেই তার আক্রোশ। কাজ করার প্রচুর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অবসর গ্রহণ করতে হয়েছে। দেখতে দেখতে কেমন করে যে ষাট পেরিয়ে গেলো ভাবতে খুব খারাপ লাগে মীর আজিমের। তেমনি শক্তি থাকলে বয়সটার টুঁটি চেপে ধরে চোয়াই কুঠুরিতে বন্দী করে রাখতো। এখন মীর আজিম কেবল অক্ষম যন্ত্রণায় হাত কামড়ায়। ঘুম আসতে চায় না। দিনে ঘুমোলে রাত নিদ্রাহীন কাটে। কখনো মাঝ রাতে একলা ঘরে চেঁচিয়ে ওঠে, আমাকে কাজ দাও। নইলে মেরে ফেলো। এখন মীর আজিমের অবসর আর কাটতে চায় না।

তার ধারণায় ষাট বছর বয়স হলেও যথেষ্ট বুড়ো হয়নি সে। মীর আজিম বুঝতে পারে না যে, শারীরিক এবং মানসিক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মানুষ কি করে বুড়ো হয়? ব্যবস্থাটাই এমন। না চাইলেও জোর করে বুড়ো বানিয়ে রাখবে। মীর আজিম শূন্যে হাত ওঠায়। মাটিতে পা দাপায়। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে আসে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোক চলাচল দেখা মীর আজিমের এক প্রিয় অভ্যেস। খুব ভাল লাগে। মানুষের ছোটা, দাঁড়িয়ে থাকা, গল্প করা, গাড়ির বিচিত্র শব্দ, কখনো রিক্সাওয়ালার খিস্তিখেউড় মীর আজিমের অবসর ভরিয়ে দেয়। এজন্যে মাসুদের প্রতি মাঝে মাঝে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ওর

বাসাটা বড় সুন্দর জায়গায়। কয়েক পা হাঁটলেই বড় রাস্তার ধারে এসে দাঁড়ানো যায়। দাঁড়িয়ে দিনযাপনের ক্লান্তি ভোলা যায়।

মীর আজিমের বউ মারা গেছে গত বছর। বুড়ো বয়সে বউ হারিয়ে যেনো শৈশবে ফিরে গেছে মীর আজিম। বড় অসহায় লাগে। কেউ না থাকার অভাবটা বুকের ভেতর টান হয়ে থাকে। যেনো কেউ খেতে না দিলে খাওয়া হয় না—বিছানাটা পেতে না দিলে ঘুম আসে না—পানি তুলে না দিলে নাওয়া হয় না। মীর আজিম একবিরাট জনশূন্য বাড়িতে পথ হাতড়ে ফিরছে যেন। মনের ফাঁকফোকড় আর কিছুতেই বুঁজিয়ে রাখতে পারে না। পদ্মাপারের হু হু বাতাস সবকিছু এলোমেলো করে দিয়ে যায়। মীর আজিমের দু'চোখ বেয়ে অনবরত জল গড়াতে থাকে।

মাসুদ বিয়ে করেছে বছর চারেক হলো। রোজী খুব ভাল মেয়ে। মীর আজিমের সুবিধে অসুবিধের দিকে নজর রাখে। কোন ত্রুটি হয় না। কিন্তু ওদের কোন ছেলেমেয়ে নেই। তিন মেয়ের ঘরে ছেলেমেয়ে আছে। কিন্তু ওরা অনেক দূরে থাকে। সব সময় কাছে পাওয়া যায় না। বড় ফাঁকা লাগে তার। সময়ই কাটতে চায় না; একটা মানুষ কতক্ষণ আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুধু মানুষ দেখে দিন কাটাতে পারে। তবে মীর আজিমের নিজস্ব ব্যাপারস্যাপারের মধ্যে একটা স্মৃতি আছে। এখন সে স্মৃতি তার একমাত্র সঙ্গী। নানারকম দুর্যোগ এবং সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও সে স্মৃতি একটুও নষ্ট হয়নি। দুমড়ে মুচড়ে যায়নি, ঝাপসা হয়নি, পোকায় কাটেনি। যখন মন ভালো থাকে না, ঘুম আসে না, বুক হু হু করে তখন মীর আজিম সে স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে সময়ের প্রবল স্রোতা কীর্তিনাশা পাড়ি দেয়। কতো ঘটনা ভুলে গেছে মীর আজিম. কিন্তু বায়ান্নোর সেই মিছিলের কথা সে একটুও ভোলেনি। তার নিজস্ব ব্যাপারস্যাপারের মধ্যে এই মিছিল জালে পড়া বড় মাছটার মতো প্রবল পৌরুষ নিয়ে লাফায়। ছোটখাটো অন্য সবকিছু ঢেকে রাখে। মীর আজিম তার একষট্টি বছরের জীবনে একবারই মিছিলে নেমেছিল। বায়ান্নোর একুশের সময় সে একটা ছোট্ট চাকরী করতো। নতুন বউ নিয়ে কেবল সংসার গুছিয়ে বসেছিল। কেউ তাকে মিছিলে যাবার জন্যে বলেনি। তবু গিয়েছিল সে। না গিয়ে পারেনি। সাধারণ মানুষ মীর আজিম। কখনো কোন কথা গভীর করে ভাবে না। অথচ

আশ্চর্য সেদিন মীর আজিমের বুকে বড় টান পড়েছিল। পদ্মার ইলিশ কিংবা বরিশালের বালাম বা যশোরের পাটালী যেমন বুকে মাতম তোলে ঠিক তেমন একটা বোধ। ওর মনে হয়েছিল ঐ মিছিলে না গেলে এই সবকিছু থেকে সে আলাদা হয়ে যাবে। সেই মিছিলে তার সামনে গুলী হয়েছিলো। পড়ে গিয়েছিল সালাম। মুখ থুবড়ে। ও বুকের কাছে জামা খামচে ধরে হাঁ করে তাকিয়ে গলগল করে বেরিয়ে আসা রক্তের স্রোত দেখছিল। সে ঘটনা মীর আজিমকে এতটা হতবাক করে দিয়েছিল যে এরপর থেকে তার মাথাটা যেনো কেমন হয়ে যায়। মীর আজিম আর কখনো মিছিলে যায়নি।

সেই মিছিলে একটি শ্লোগান ভীষণ প্রিয় হয়েছিল ওর। চিৎকার করে যখন সে শ্লোগান বলতো তার মনে হতো হৃৎপিণ্ডের একদম বোঁটার কাছ থেকে শব্দগুলো উঠে আসছে। ঐ শব্দগুলো বলতে না পারলে হৃদপিণ্ডটা টুপ করে ঝরে পড়ে যাবে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানটা ওর চারদিকে একটা নিরেট প্রাচীর তুলে রেখেছিল। মগজে ঘূর্ণি তুলতো। সে জের এই ষাট বছর বয়সেও কমেনি। অথচ জীবনে মীর আজিম আর কখনো কোথাও কোন শ্লোগান দেয়নি।

মাসুদ যখন খুব ছোট, আধো আধো কথা বলতে শিখেছে কেবল তখন ঐ শ্লোগানটা ছেলেকে শিখিয়েছিল মীর আজিম। মাসুদ পরিষ্কার উচ্চারণ করতে পারতো না। ভুল উচ্চারণে সুর করে টেনে টেনে বলতো শব্দগুলো। মীর আজিমের বুক গর্বে প্রসারিত হয়ে উঠতো।

—খুব ভালো কথা নারে মাসুদ?

মাসুদ না বুঝে বাপের কথায় সায় দিতো। বউ মাঝে মাঝে রেগে যেতো।

—আচ্ছা তোমার কি আর কোন কথা নেই?

—থাকবে না কোনো? তোমার সঙ্গেতো আমি অনেক কথা বলি গিন্নী—প্রাণ খুলে বলি। অফিসের লোকজন আছে, পাড়াপড়শী, আত্মীয়-স্বজন আছে। সবার সঙ্গেইতো মেলা কথা বলি। বলি না? মীর আজিম বৌতুকে বৌ-র দিকে তাকায়।

—সবই বুঝলাম। কিন্তু এ একটা কথা বড় বেশী বলো। কি যে আরাম পাও!

সব কথার মূল কথাই যে ঐ একটা কথা গিন্নী। আমার মাথার মধ্যে স্থির হয়ে গেছে।

মীর আজিম বুক টান করে বলে। মুখটা আনন্দে উচ্ছ্বাসে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বেশি বোঝে না ও। তবে বুকে টেনে নিলে আর কিছুতেই ফেলতে পারে না। সেটা বুকের মধ্যেই থাকে। তার বউ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়। কোন কথা বলতে পারে না। কি বলবে বোঝেও না। চিরাচরিত মেয়েলী ঢঙে, তোমার ভীমরতি হয়েছে বলে, রান্নাঘরে চলে যায়।

মীর আজিম প্রাণ খুলে হাসে। জানে তার বউয়ের দৌড় ঐ পর্যন্ত। তবে বৌটি ভালো। চমৎকার রাঁধে। যত্ন করে খাওয়ায়। সর্দি হলে বুকে পিঠে রসুন দিয়ে গরম সর্ষের তেল মালিশ করে দেয়। এতেই বর্তে যায় মীর আজিম। এ ছাড়াও গুনগুনিয়ে গান গাইতে গাইতে কাঁথা সেলায়। ছেলেমেয়ের দেখাশোনা করে। এর বেশি একজন মানুষের কাছ থেকে আর কিইবা চাইতে পারে মীর আজিম! না খুব বড় ধরনের কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা তার নেই।

যেদিন তার বৌ, আজীবনের সঙ্গী, তার খুব কাছের মানুষটি মারা গেলো সেদিন হেঁচকি তুলে কেঁদেছিল মীর আজিম। বুক তোলপাড় করে শূন্য হয়ে গিয়েছিল সব সাধ-আহ্লাদ। সাধারণ মানুষ মীর আজিম বেশি কিছু ভাবতে পারে না, কিন্তু সেদিন বউকে শাদা কাফন পরানোর পর সেই মিছিলের দৃশ্যটা মীর আজিমের মনে হয়েছিল অবিকল সালামের মতো হয়ে গেছে তার প্রিয়তম সঙ্গী। অবিকল সালাম। কেমন করে যে চেহারা এমন মিলেমিশে এক হয়ে গেল ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারেনি মীর আজিম। বউকে কবরে নামানোর পর ওর মাথাটা বিগড়েছিল। বিড়বিড় করে তার প্রিয় শ্লোগানটি উচ্চারণ করেছিল, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।' সেদিন সবাই তাকে গালাগাল করেছিল। মৌলবী সাহেবতো মারতে উঠেছিল। তাকে পাগল ঘোষণা করে উত্তেজিত মৌলবী সাহেবকে ঠাণ্ডা করেছিল তার বড় ভাই। সে কাউকেই বোঝাতে পারে না যে ভীষণ দুঃখে ঐ শ্লোগান ছাড়া অন্য কিছু মনে থাকে না কেন তার। ও নিজেও বোঝে না যে কেন এমন হয়! ঐ মিছিল আর শ্লোগান মীর আজিমের বেদনা এবং আনন্দ।

এখন এই অবসর জীবনযাপনে মীর আজিম সময় সময় দারুণ নস্টালজিক হয়ে যায়। নস্টালজিক হতে ভালোও লাগে। চাকরীর খাতিরে অনেক জায়গায় ঘুরতে হয় তাকে। মফস্বল শহর, থানা, এমনকি কখনো প্রত্যন্ত অঞ্চলেও। সেসব দিনগুলো ভালোই ছিল তার জন্যে। বউ বিরক্ত হতো। পছন্দ করত না। বিশেষ করে মেয়েরা বড় হয়ে যাবার পর সে আর গ্রামে যেতেই চাইত না। মুখ ঝামটা দিতো।

—ঐ অজ পাড়াগাঁয়ে মেয়েদের নিয়ে যাব না আমি।

—আমার তো যেতে হবে। নইলে চাকরি...

—শুধু চাকরী না; যেতে ভালোও লাগে তোমার। নইলে চেষ্টা করলে তুমি শহরে থাকতে পার না?

—না, গিন্নী তা নয়, তুমি বোঝ না—

—বুঝি, বুঝি, খুব বুঝি।

বউ রাগ করে। মীর আজিম চুপ করে থাকে। বেশি কথা বলে বউকে চটাতে চায় না।

—ছয় মাস থেকে আসি গিন্নী, তারপর চেষ্টা করে বদলি নেব।

—তাতো বলবেই। বিয়ের পরও বাপের বাড়ির ভাত আমার কপাল থেকে উঠল না।

—মাত্র ছ'টা মাস গিন্নী—

মীর আজিম বিগলিত হাসে। বউ নরম হয়।

—তোমার খাওয়াদাওয়ার অসুবিধা হবে?

—ও নিয়ে ভাবতে হবে না। তোমার কাছ থেকে তো আমি রান্না শিখেছি। রাঁধতে আমার ভালোই লাগে।

বউ হেসে ফেলে। এর পর তো আর কথা চলে না। অনেক জায়গায় বউ-ছেলেমেয়ে ছাড়া একা কাটাতে হয়েছে তাকে। সেজন্য বউ তাকে রান্না শিখিয়েছিল। এখন রান্নায় একদম পাকা হাত মীর আজিমের। কোন্ মাছের সঙ্গে কোন্ তরকারী দিলে ভালো লাগবে তা সে জানে। করতোয়ার পাইলস মাছের সঙ্গে নদীর ধারের মিষ্টি আলুর শাক রাঁধলে মীর আজিম প্রয়োজনের বেশি ভাত খেয়ে ফেলে। পদ্মার ইলিশের সঙ্গে পুঁইশাক কিংবা কাঁটা বাতাসীর চচ্চড়ি পেলে মীর আজিম আর কিছু চায় না। শীতকালের জমানো বোয়াল মাছের তরকারী

আর কড়কড়ে ঠাণ্ডা ভাত সকালে পেট পুরে খেলে দুপুরের আগে তার কোন খিদেই পায় না। খাবারদাবারের এই ব্যাপারগুলো মীর আজিমের একদম নিজস্ব। মাঝে মাঝে রোজীর সঙ্গে রাগ করে বউমা কি যে রোজ রোজ মাংস রাঁধ, আমার একটুও ভালো লাগে না। কাল খল্‌সে পুঁটি মাছ আর কুমড়ে শাক আনিও।

রোজী মাথা নেড়ে সায় দেয়। প্রতিবাদ করে মাসুদ।

—এতো ভালো ভালো খাবার থাকতে তুমি যে কি শাক-লতা পছন্দ কর বাবা?

মীর আজিম রেগে যায়।

—আমার ব্যাপারে নাক গলাতে আসিস না। আমি তো জানি তোরা নিজেরটা চাইতে পরেরটা বেশি ভালবাসিস।

মাসুদ চুপ করে থাকে। ও জানে এগুলোই তার বাপের স্বভাব। এই গণ্ডীর বাইরে সে কিছুতেই আসবে না। শুধু চাকরির অজুহাতে নয়, দেশটার সব জায়গায় ঘোরার জন্যে কেমন একটা টানও ছিল মীর আজিমের। বেশিদিন এক জায়গায় কাটালে অস্থির হয়ে উঠতো। কতোদিন সন্ধ্যায় নদীর ধারে হাঁটতে হাঁটতে কখনো আপন মনে বলেছে, নদী রে আমি রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

অথচ তখন বায়ান্নোর পর বারো বছর পার হয়ে গেছে। কেন যে এই শ্লোগানটা ভুলতে পারে না মীর আজিম! দূরের গ্রামে কাজ সেরে সাইকেলে করে অনেক রাতে বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে ফিরতে ভয়ের ছমছমানি খলবলিয়ে উজান বইতো। ভীতু স্বভাবের লোক সে। তখন ঐ শ্লোগানটা জোরে জোরে আউড়ে গতি বাড়িয়ে দিতো সাইকেলের। ভয় কেটে যেতো—সরে যেতো বাঁশঝাড়ের ছায়া। ঐ শ্লোগানটা বলার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোন কিছুই আর মনে থাকে না মীর আজিমের। এখন এই অবসর জীবনে কোন কাজ নেই, কোন বদলী নেই, কোন জায়গা দেখার আনন্দ নেই। বড় দুর্দিন যাচ্ছে মীর আজিমের। গত বছরেও চাকরী ছিল তার। শেষবারের মতো শ্রাবণের বৃষ্টিমুখর রাতে করতোয়া পাড়ের গণ্ডগ্রামে একরাত কাটিয়েছিল সে। বৃষ্টির শব্দে উন্মনা হলে আর ঘুম আসে না। ব্যাকুল হয়ে ওঠে মন। পিয়ন কফিলকে ডেকে ওঠায়। কফিল চোখ কচলে হাই উঠিয়ে ভীষণ চপেটাঘাতে মশা মারে।

—জানিস কফিল, আমার চাকরি জীবনের শুরুতে একটা বিরাট মিছিল হয়েছিল। তোর তখন জন্মই হয়নি।

—জ্বী স্যার।

—সেই মিছিলে গুলি হয়েছিল কফিল।

—গুলি? গুলি আর এমন কি। আমি স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। কত গুলি চালালাম।

—আঃ কফিল আমার কথা শোন না। সেই মিছিলে আমরা একটা শ্লোগান দিয়েছিলাম।

—কি?

—রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

—খুব ভালো শ্লোগান।

—এখনো আমার ঐ শ্লোগানটা দিতে ইচ্ছে করে।

—আমারও। আমিও আপনার সঙ্গে শ্লোগান দেব।

—ঠিক বলেছিস্ কফিল। তুই, আমি এবং আরো অনেকে আমরা আবার সেই শ্লোগান দেব। আমাদের এখনকার সময়টা খুব খারাপ রে কফিল।

মীর আজিমের কথার ফাঁকে ভীষণ শব্দে বাজ পড়ে। ব্যাঙের ডাক কানে তালা ধরায়। কফিলের ঝিমুনি বাড়ে। কিন্তু ঘুম আসে না মীর আজিমের। বেশি উতলা হলে ঘুম আসতে চায় না তার। স্নায়ু বিকল হয়ে যায়। কেবলই মনে হয় পৃথিবীর কোথাও কি এমন বর্ষণমুখর শ্রাবণ রাত আছে? নেই, নেই। এ জন্যেই তো এই দেশটা বুকের মধ্যে সারাক্ষণ মেতে থাকে।

স্বদেশের কত জায়গায় ঘুরলো মীর আজিম। দারিদ্র্য ছাড়া আর কিইবা দেখেছে। মানুষ মানেই তো ন্যাংটা শরীর আর ক্ষিধের পেট। নদী, ধানক্ষেত, বাঁশবন, জোনাকজ্বলা রাত ইত্যাদি অনেক কিছুই কেবল মীর আজিমকে অন্য জগতে নিয়ে যায়। তবু দেশটা মীর আজিমের বড় প্রিয়। একে ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার কথা চিন্তা করতে পারে না। মাসুদ মাঝে মাঝে অনেক টাকার চাকরী নিয়ে কোথায় কোন মরুভূমির দেশে যাবার কথা বলে। মীর আজিমের বুক খাঁ খাঁ করে ওঠে। মাসুদ বড় অবুঝ। বুঝতে চায় না। ও নিজের স্বার্থের কারণে দেশের অনেক

কিছু অবলীলায় ভুলে যেতে পারে। একটুও বুকে বাধে না ওর। মাসুদের চোখমুখ দেখলে ভয় পায় মীর আজিম। বড় কিছুর স্বপ্নে অন্য কোথাও ছুটে যাবার নেশায় ওর চোখ জ্বলজ্বল করে।

মীর আজিম প্রায়ই ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে। মাসুদ বাপকে বেশি পাত্তা দেয় না। কথা বললে শুনতেই চায় না। সেজন্যে মীর আজিম ওর সঙ্গে গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। কখনো কথা না খুঁজে পেয়ে বলে, তোকে ছেলেবেলায় একটা শ্লোগান শিখিয়েছিলাম মাসুদ?

—উঃ বাবা, তুমি বড্ড সেকেলে কথা বল। আধুনিক হতে পারলে না। তোমাকে কত বলেছি দৃষ্টিটা এবার সামনের দিকে ফেরাও। না, তা ছেড়ে তুমি কেবল কোথায় কোন নদীর ধার, ধানক্ষেত, বাঁশবন যতোসব আজে-বাজে উদ্ভট ভাবনায় মেতে থাকো।

মাসুদ রেগে উঠে যায়। বাবার এইসব একঘেঁয়ে কথা শুনতে ওর ভালো লাগে না। মীর আজিম তবুও জোর করে বলে, সেই শ্লোগানটা তুই মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বড় চমৎকার করে বলতি?

আঃ বাবা এখন সেদিন নেই। আমার বয়স এখন বত্রিশ।

তুমি আর ঠিক হবে না দেখছি।

মাসুদ রেগে উঠে যায়। মীর চুপচাপ বসে থাকে। সময়ের হিসেব কষে। এখন আশি সাল। জানুয়ারীর পনেরো পার হয়ে গেছে। গত বছরও তার চাকরি ছিল। এখন নেই। বড় খারাপ সময় যাচ্ছে মীর আজিমের। এখন সে একলা একলা ঘুরে বেড়ায়। সকালের ঠিক নেই, দুপুরের ঠিক নেই। রোজী মাঝে মাঝে অনুযোগ করে, বাবা এভাবে ঘোরাঘুরি করলে আপনার শরীর খারাপ করবে।

—আর কটা দিনইবা বাঁচব বৌমা।

—একথা কেন বলছেন বাবা? এখনো আপনার স্বাস্থ্য তো খুব ভালো। আপনি বসুন বাবা, এক গ্লাস দুধ নিয়ে আসি।

রোজী দুধ আর বিস্কিট এনে দেয়। মীর আজিম তৃপ্তির সাথে দুধে চুমুক দেয়। মাসুদ সারাদিন প্রায় ঘরেই থাকে না। কোথায় কোথায় ঘোরে কে জানে। টাকার নেশায় মেতেছে ও। মীর আজিম বিড়বিড় করেন, আমার ছেলে মাসুদ স্বদেশকে ভুলতে বসেছে। ও অন্য কোথাও

চলে যেতে চাইছে। ওর নাকি অনেক টাকার প্রয়োজন। আহ্ আমার বুকটা এমন করে কেন? ওতো আমারই ছেলে মাসুদ। আমারই ঔরসজাত সন্তান। আমি তো জানি ওর জন্মে কোথাও কোন গলদ নেই। আমি তো জানি ও বেজন্মা নয়। আমি তো জানি ও জারজ নয়। তবু এমন হলো কেন?

প্রচণ্ড কাশিতে মীর আজিম বুক চেপে ধরেন। বিষম খেয়েছেন। চোখে পানি এসে যায়।

—কি হয়েছে বাবা?

—মাসুদ কোথায় বৌমা?

ঐ তো বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারে দৌড়াদৌড়ি করছে। পাসপোর্ট. ভিসা—

—থামো।

মীর আজিম থমকে ওঠেন।

—আপনার কিছু লাগবে বাবা?

—না।

রোজী চলে যায়। মীর আজিম বসে বসে শাদা আকাশ দেখে। বৌ বেঁচে থাকতে একটা কথা বলার লোক ছিল। এখন মীর আজিমের কথা বলার কেউ নেই। তার সঙ্গে কথা বলার কারো সময় নেই। আর সেজন্যই একলা একলা ঘোরে। যখন তখন ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায়।

দেখতে দেখতে মাঘের শীত ফুরিয়ে যায়। ফাল্গুন এলেই মীর আজিমের নাড়িতে টান পড়ে। বাতাসে পাগল-করা গন্ধ পায়। ভোরের ফুরফুরে বাতাস তাকে দিশেহারা করে। বাবার আচরণে মাসুদ বিরক্ত। সেজন্যে মাসুদের সঙ্গে কথা বলা তার হয় না। তবু রোববার ভোরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে মাসুদকে বলে, ফাগুন এসেছে মাসুদ?

—তাতে কি হয়েছে?

—এই ফাল্গুনে একটা মিছিল হয়েছিল।

—যত্তসব! তোমার এই রোগ আর সারবে না।

—তুই এখন অনেক বড় হয়েছিস মাসুদ।

—সামনের সাতাশ তারিখে আমার ফ্লাইট বাবা। সব ঠিকঠাক হয়ে গেলো।

—কাল তুই অনেক রাতে ঘরে ফিরেছিলি?

—হ্যাঁ, সব গোছগাছ করতে হচ্ছে তো।

—আমি তখনো জেগেছিলাম। দরজার কড়া নাড়ার পর তোর পায়ের শব্দ শুনেছিলাম। সেই শব্দ আমার খুব ভালো লাগছিল। বৌমা বড় লক্ষ্মী মেয়ে মাসুদ।

—আর কয়দিন পর ওকে ওর বাবার বাড়িতে দিয়ে আসব। মাস ছয়েক পর আমার ওখানে যাবে। তুমি মায়ার সঙ্গে থাকবে। এই বাড়ি ছেড়ে দেব।

—আজ কয় তারিখ মাসুদ?

—সতেরো।

—আর তিন দিন পর একুশ। বায়ান্নোর এই দিনগুলোয় ঢাকা গর্জে উঠেছিল। প্রতিদিন ঘটনা ঘটতো। সে সময়ের ঢাকার মানুষ সারাক্ষণ বুকে আগুন রাখতো। তোরা আজকালকার ছেলেরা তু করে ডাকলেই ছুটে যাস। ভালমন্দ বুঝতে চাস না। আমরা বুঝতাম। রুখে দাঁড়াতে জানতাম।

মীর আজিম টের পায় না যে মাসুদ চলে গেছে। ও এখন অনেক টাকা রোজগারে যাচ্ছে। সে টাকায় সুখ কিনবে, স্বাচ্ছন্দ্য কিনবে, শান্তি কিনবে। সব কিনবে।

—শোন মাসুদ, সে সময় না একটা ঘটনা ঘটেছিল—মীর আজিম হো হো করে হেসে ওঠে। তারপর খেয়াল করে যে পাশে মাসুদ নেই। সেই হাসির ঘটনাটা আর মাসুদকে বলা হয় না। তবু সে ঘটনা মনে করে আপন মনে অনেকক্ষণ হাসে।

একুশের খুব ভোরে মীর আজিম রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। সূর্য ওঠেনি। চারদিকে আঁধার আঁধার ভাব। মাসুদ রোজী ঘুমুচ্ছে। ওরা কখনো একুশের ভোরে বের হয় না। ওদের নাকি ভালো লাগে না। মীর আজিম বুকের জমাট বিষণ্ণতা হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। হতাশার গায়ে খাবলে খুবলে ফোকর তৈরী করতে বড় পটু সে। ছেলেমেয়েরা খালি

পায়ে মিছিল করে যাচ্ছে। মীর আজিমও সে মিছিলের সঙ্গে শহীদ মিনারের দিকে হাঁটতে থাকে। সেদিন যখন গুলি হয়েছিল তখন মীর আজিম কাছেই ছিল। গুলি তার কানের পাশ দিয়ে সাঁই করে বেরিয়ে গিয়েছিল। তার গায়েও লাগতে পারতো গুলিটা। লাগেনি। লাগেনি বলেই আশি সাল পর্যন্ত বেঁচে আছে সে। সে স্মৃতির দগদগে জ্বালা বুকের গভীরে। হাঁটতে হাঁটতে তার ভেতরের সব কিছু কেমন ওলোট-পালোট হয়ে যায়।

মনে হয় এখন সে বায়ান্নোর ঢাকার রাজপথে। চারদিকে অগণিত মানুষের মিছিল। মানুষের কণ্ঠ বুলেটের মত আগুন হয়ে ছুটছে। মীর আজিমের মনে হয় বাতাসে পদ্মার ইলিশ ভাজার গন্ধ আসছে। মনে হয় এই তার নিশ্বাস। বাতাসে বালাম চালের সোঁদা গন্ধ ভাসছে। তার হৃৎপিণ্ড হালকা করে দিচ্ছে। আহা, এর মধ্যেই তার শ্লোগান আর মিছিল। তার রক্ত চলাচল। হাজার হাজার বছরের বাসাবাড়ি। মীর আজিম ভুল করে পারিপার্শ্বিক। মিছিল নিয়ে চলে যাওয়া ছেলে-মেয়েগুলোর জন্ম যে বায়ান্নোর অনেক পরে সেটা তার মনে থাকে না। এখন ফাগুনের রাগী বাতাস চাবুক হয়ে যে দাপায় না সেটা সে টের পায় না। এটা যে আশি সাল তাও বেমালুম হজম হয়ে যায়। শুধু তার মনে হয় এখন চারদিকে দারুণ ষড়যন্ত্র। রুখে না দাঁড়ালে গ্রাস করবে। বায়ান্নোর ঢাকায় মীর আজিমের এখন পুরো যৌবন।

ছেলেমেয়েগুলো গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দিচ্ছে। মীর আজিম ওদের সঙ্গে গলা মেলায় না। কোন শ্লোগানই তার পছন্দ হয় না। মনে হয় এগুলো কোনটাই বিরূপ পরিবেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ভাষা নয়। ওদের গলায় তেজ নেই কেনো? ওরা কি ষড়যন্ত্রের অবয়বটাকে অনুধাবন করতে পারছে না! মীর আজিম ওদের ওপর বিরক্ত হয়। এতোটা সময় পেরিয়ে আসার পর তার মনে হয় সে যে-শ্লোগানটা দিয়ে-ছিল সেটাই এখনো সত্য। সে চুপচাপ হাঁটে আর ওদের শ্লোগান উপেক্ষা করে প্রাণপণে নিজের ভেতরে শক্তি সঞ্চয় করে।

শহীদ মিনারের সামনে এসে মীর আজিম আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। মিছিলের ছেলেমেয়েরা থামতেই সে তার বজ্রকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

মুহূর্তে গুঞ্জন থেমে যায়। ফুলে ঢাকা শহীদ মিনারের সিঁড়িতে দাঁড়ানো মীর আজিমের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ছেলেমেয়েরা। থম্ ধরে থাকে চারপাশ। সবাই দেখে লোকটা বায়ান্নো সালের শ্লোগান বুকে নিয়ে এখনো কেমন অটল ও অনমনীয়।

মীর আজিম শূন্যে হাত উঠিয়ে প্রাণভরে শ্লোগান দিতে দিতে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

উনিশ' শ' তিয়াত্তরের একটি সকাল

আহমদ বশীর

দোতলা থেকে ডাকলে নিচে খুব তাড়াতাড়ি শব্দ পৌঁছয় না। তাই জামিল খুব উচ্চস্বরে ডাকলো, 'আবদুল। আবদুল।'

আবদুল নিচে থেকে উত্তর দেয়, 'জি, স্যার।'

'কেউ আইলে উরফে পাঠায়া দিষ। বুজ্‌ছস।'

—হ'

বিশাল বাড়িটা গমগম প্রতিধ্বনি শোনে। বাইরে বসন্ত রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়া পাতাবাহারকে কাঁপিয়ে দেয়, তখন সহসাই বন্দুকের শব্দ, বারুদের ঘ্রাণ আর দূরাগত শ্লোগানের স্বর যেন সমস্ত ঢাকা শহরের অস্থির হৃদয়টাকে চিরে নেড়েচেড়ে খেলতে থাকে।

ইণ্ডিয়াকিং সিগারেটের প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে জামিল টেবিলের ওপর পা তুলে দিলো। 'শালা, টাইম ইজ দ্য মেইন ফ্যাক্টর। বুঝলি! সময় ঠিক থাকলে রেজুলিউশনের বারোটা বাজাতে পারতো না কেউ।' জামিল সিগারেট জ্বালিয়ে ধোঁয়ার মধ্যে আত্মপ্রতিকৃতি খোঁজে। 'ঢাকা শহরে বসে ইণ্ডিয়াকিং সিগারেট খাওয়া, সিক্সটিনাইনে তুই কল্পনা করতে পারতিস জয়ন্ত? ইণ্ডিয়ান জিনিসপত্র যেভাবে আসছে···অর্থনীতি ফ্লুপ করতে বেশী দেরি নাই···।'

জয়ন্ত, চশমাপরা লোকটা, যেন দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'তুই যা'ই বলিস। সিক্সটিনাইনের গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে কিন্তু আমি একটা থিসিস লিখবো দোস্ত।'

'থিসিস!' জামিল হেসে ফেলে। 'ওসব থিসিস লিখ্যা কিছু হবে না দোস্ত। অহন দরকার অন্যকিছু।

'তার মানে? তুই কি বলতে চাস, ইতিহাসের বিশ্লেষণটা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়?'

'না, না। আমি ঠিক সেরকম মিন্ করিনি। আমি আসলে বলতে চাই—আমাদের এখন দরকার।

'আমাদের কি দরকার? আমি বিশ্বাস করি আমাদের পার্টি ফর্ম ম্যারা এইতো মোক্ষম টাইম। পিপ্‌ল আর কনশাস।' গোলাপী শেড দেওয়া টেবিল ল্যাম্পের আলো জয়ন্তর কণ্ঠস্বর প্রত্যাখ্যান করে না—জয়ন্ত তার বিশ্বাসকে মেলে ধরে।

'পিপ্‌ল কি আসলেই কনশাস!' জামিলের মাথার মধ্যে ঘূর্ণি-চক্রের মতো নাচতে থাকে ভাবনা: সে জানে ওরা আসলে পা বাড়ানোর জন্য যুক্তি খাড়া করছে। কথাটা সে বহুদিন ধরে ভেবে রেখেছিলো, আজ বললো, 'আসলে আমি বলতে চাই, আমাদের একটা সিদ্ধান্ত দরকার। দিস্ অর দ্যাট। আমাদের দরকার ...'

জয়ন্ত হাত নেড়ে থামিয়ে দেয়। 'আহ্ হা। শামসু ভাই এলে তোকে সব কথা বুঝিয়ে বলবে। পুরানো পার্টির সঙ্গে থাকলে আমাদের সামনে হতাশা ছাড়া আর কিছু থাকবে না। শামসু ভাই বলেছেন, ক্ষমতা জিনিসটাই বাই-রোটেশনে আসে—শামসু ভাইকে আসতে দে।' হাতঘড়ির দিকে তাকালো জয়ন্ত। 'আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই উনি চলে আসবেন।'

শামসু ভাই চলে এলেই সব সমস্যার সমাধান। শামসু ভাই, দি গ্রেট লিডার। জামিল ঘরের কড়িকাঠ গুণলো। কি বিশাল দরজা জানালা—কাঠের মধ্যে অদ্ভুত কারুকাজ। জামিল জানে, শামসু ভাই এলে সেই পুরানো কথা শুরু হবে। দেশ স্বাধীন হয়েছে, রাজনীতি নতুন মোড় নিচ্ছে। বর্তমান পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাসলাইনে চলে আসতে হবে...পুরানো খোলস ফেলে নতুন মোড়ক। সাপের মতোন। তখন শামসু ভাইয়ের ইস্পাতের চোখ দুটো নড়ে উঠবে একটু। ক্ষমতা কি বাই-রোটেশনে ভাগাভাগি করতে হয়?

তখন ঘরের মধ্যে স্তূপীকৃত পোস্টার আর হ্যাণ্ডবিল থেকে চোখ সরিয়ে এনে দেওয়ালে ঝুলন্ত নেতার ছবির দিকে রাখলো জামিল। তারপর টেবিলের ওপর একটা এস, এল, আর, পানির জগ। রেডিও, সিগারেটের প্যাকেট। এগুলো থেকে সম্পর্কহীন হতে চেয়ে সে বললো, একটা ব্যাপার আমি বুঝি না জয়ন্ত। শামসু ভাই একুশে ফেব্রুয়ারীর দিনটাকেই ঠিক করলো কেন? জয়ন্ত একটু হাসে। 'আগামীকাল সকালেই একুশে ফেব্রুয়ারী। মহান ভাষা আন্দোলনের দিন। এদিনই

জেগে উঠেছিলো সমগ্র বাঙ্গালী জাতি।' জয়ন্ত শুধু বক্তৃতা দিতে ভালোবাসে; প্রতিটি শব্দের ওপর ঝোঁক্ পড়ে তার--কিন্তু আজকের বক্তৃতাটি শেষ করতে পারে না সে; তার আগেই সদর দরজায় কড়া নাড়ার ধ্বনি ওঠে—এবং জামিলের চিৎকার, 'এ্যাই আবদুল, চাবকাইয়া পিঠের ছাল তুইলা নিমু কইলাম। ক্যাডায় আইছে, দেখবার পারস না? তখন জামিল বাইরে আসে, দোতলার সিঁড়ির কাছে, আলো জ্বালায় আর পুরানো বাড়িটার ইটগুলো চমকে ওঠে।

আবদুল মানেই তো কাজের ছেলে। তার লুঙ্গি পরা শীতার্ত শরীর একুশে ফেব্রুয়ারীর ঠাণ্ডা বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। তবু সে সঙ্গে করে নিয়ে এলো দু'জন মানুষের পদধ্বনি। দুইহাতে দুই বাণ্ডিল বই নিয়ে ঘরে ঢুকলো শফিক আর কামাল।

'কি ব্যাপার এতো রাত হলো?' জামিল প্রশ্ন করে।

'আরে রাত হবে না তো কি? সাত দিনে সংকলন বের করতে বলেন আপনারা? প্রেসের অভিজ্ঞতা তো আপনাদের নেই। থাকলে বুঝতেন বুক প্রোডাকশন কাকে বলে।' শফিক কৃতিত্বের হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে রেখে বলে।

'আহা হা। তুমি হলে সাংবাদিক-সাহিত্যিক। লিটারেচার বিষয়টাই তোমার। প্রিন্টিং পাবলিশিং...'

'আর বলতে হবে না। নেন এবার সব খুলে দেখেন। এবারের বেস্ট সংকলন হবে এটা। প্রোডাকশন ভালো না হলে ট্যাকা ফেরত।'

জামিল একটা সংকলন হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে। 'ওহ্। ওয়াণ্ডারফুল প্রোডাকশন। রক্তশপথ। কাইয়ুম চৌধুরীর প্রচ্ছদ।'

'ইয়েস। কাইয়ুম ভাইয়ের মতো লোক এক কথায় প্রচ্ছদটা এঁকে দিলো। শফিকের উদ্ভাসিত মুখে আনন্দ।

জয়ন্ত, চশমাপরা লোকটা তখন এক কপি সংকলন নিয়ে টেবিল-ল্যাম্পের দিকে তির্যকভাবে দেখে। চশমার ভিতর তার নিরীক্ষাপ্রবণ দৃষ্টি যেন সহসাই বিস্ফারিত হলো; 'ওহ্ ওয়াণ্ডারফুল। উৎসর্গটা তো ভারি সুন্দর! আবহমান বাঙলা, বাঙালী। কোথায় জানি, পড়েছিলাম ... কিন্তু একি। আমাদের পার্টির মেনিফেস্টো কই?' মেনিফেস্টো। সে যেন তড়িতাহত এমনিভাবে লাফিয়ে উঠলো।

ফলতঃ শফিকের মুখভঙ্গি, সে দু'হাত তুলে চার্লি চ্যাপলিনের মতো নেচে উঠলো। 'আবার মেনিফেস্টো কেন? একুশের সংকলনে মেনিফেস্টো কেন? একুশের সাহিত্য মানেইতো জাগরণের সাহিত্য। দ্যাট ইজ এনাফ।'

জয়ন্ত চোখ থেকে চশমা নামিয়ে প্রশ্নার্ত হয়ঃ এটা কি খেয়ালখুশি নাকি? এ্যা? আমাদের নিউবর্ন পার্টির মেনিফেস্টো ছাপানো অত্যন্ত জরুরী।'

'নো। নো। সাহিত্য হলো সাহিত্য। লিটারেচার ইজ লিটারেচার। লিটারেচারে স্লোগান থাকতে পারে না।'

'একুশ মানে কি?' – জয়ন্ত চিৎকার দিলো। তার বিবেচনা শুকনো ধারালো গলার উচ্চগ্রামে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়ঃ আমাদের মেনিফেস্টো। শামসু ভাই বলেন ...'

তখন কামাল বাগড়া বাঁধায়। 'আহ থোন ফালায়া আপনাগো পলিটিকস। আমি অহন হিসি দিমু। জামিল ভাই আপনাগো লেট্রিন কো?"

কামাল যে খুব ফুর্তিবাজ ছেলে সেটা দেখলেই বোঝা যায়। পার্টির কালচারাল দিকটা বুঝি সে-ই দেখবে। তার লম্বা এলোমেলো চুল, জুলফি আর গলার হাড় সব কিছু চম্‌কে ওঠে, আর সে জামিলের হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে আসে। তখন বিশাল প্রাসাদ নিশ্চুপ, আবছা অন্ধকারে তার আয়তন শুধু টের পাওয়া যায়। দু'তিনটা ঘর অতিক্রম করে ওরা লেট্রিনের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কামাল বুঝি একটা হিন্দী গান গুণগুণ থামিয়ে বলে, 'বিল্ডিংটা ভাই দারুণ বানাইছেন উস্তাদ। 'কুন শালা হারামি বানাইছিলো।'

'আরে দারুণ হবে না কেন? বায়েজিদ ভাইদের নাম হোনেন নি? এই দালান তো তাগোই। মোট রুম কয়টা জানেন? গোণাগুণতি বাইশটা।'—জামিল হাসতে হাসতে বললো।

'এতো রুম দিয়া আপনে কি করেন? ভাড়া দিবার পারেন না?'

'দিমু, দিমু। কেবল তো দখল করছি। পার্টি থাকলে আরো কত হইবো। শামসু ভাই কয়, খালি দখল করলে চলবো না। কামও করতে হইব।'

'আপনে পারেনও উস্তাদ!' কামাল গম্ভীর স্বরে বলে, 'রাশিয়ার বিপ্লবের পর শীত প্রাসাদ ....

সহসা থ্রি নট থ্রি গর্জে উঠলো কাছে কোথাও। রণদামামা নেই, শুধু বিস্ফোরণের শব্দ খুব কাছে। দ্রিমি দ্রিমি বারুদের শব্দে, কা-কা করে উঠলো এক ঝাঁক কাক। বাথরুমের দরজা ধরে চেঁচিয়ে উঠলো জামিল, 'কুন হালায় আবার কাউঠ্যামি লাগাইলো এ্যা!

কামাল দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে যায়ঃ একুশে ফেব্রুয়ারীর রাইতেতো, একটু হাঙ্গাম হইতাছে।

'পোলাপানের কাছে বন্দুক। সময় নাই অসময় নাই, খালি ফট্ ফট্।'

'যুদ্ধের পর সব দেশেই এমুন হয়। অস্ত্র কি এত তাড়াতাড়ি ফেরত নেওয়া যাবে মনে করেন। সবে তো একটা বছর গেলো।

জামিল চিৎকার দিয়ে বলে, 'অই আবদুল, দরজাটা কইলাম ভালো কইরা লাগায়া রাখবি!'

নিচের তলা থেকে আবদুল উত্তর দেয়, 'হ সাব, বন্ধ কইরা রাখছি।'

ওরা দৌড়ে চলে এলো ঘরে। ঘরের মধ্যে তখন প্রচণ্ড উত্তেজনা। জয়ন্ত একটা সংকলন হাতে বক্তৃতা দিচ্ছেঃ সামনে যে নতুন দিন, সেখানে আমাদের সর্বহারা মানুষের ন্যায্য অধিকার আমাদের আদায় করতেই হবে। গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করতে হলে বুর্জোয়া ভাব-বিলাস ত্যাগ না করে উপায় নেই। তারপর ইতিহাস প্রসঙ্গ, তারপর উজ্জ্বল যুক্তি, আর জয়ন্তর চশমার কাঁচে প্রতিবিম্বিত হলো দৃশ্যপট। জামিলের মনে হলো, উনসত্তরের দিনগুলো যেন এখুনি জানালার পর্দায় ভেসে উঠবে। ইকবাল হলের রাত, শ্লোগানের স্বর, আপোষ না সংগ্রাম, সংগ্রাম, সংগ্রাম—চলচ্ছবিগুলো থেকে দৃষ্টি ফেরানো যায় না।

তারপর আবার ইণ্ডিয়াকিং সিগারেট, তীব্র তামাকের গন্ধ। জনতা এখন বিচ্ছিন্নতায় ভুগছে। জয়ন্ত উচ্চস্বরে বোঝাতে চায়, 'কিন্তু আমি বিশ্বাস করি মওলানা ভাসানী যদি ডাক দেয়। মানুষ আবারও সংগঠিত হতে পারে।'

শফিক হাত নেড়ে উত্তর দেয়, 'কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার। বামপন্থীদের নিয়ে কোন ক্রিয়ার কনসেপশনে পৌঁছানো যায় না।'

'অসুবিধা তো ওখানেই। বামপন্থার ভবিষ্যৎ হয়তো এভাবেই....। এতবড় মুক্তিযুদ্ধের সময়ই ওদের কোন ঐক্য হলো না।' জয়ন্তর তরুণ মুখে রক্তাভা এসে লাগে। এ দেশের মানচিত্র নিয়ে সে ভয়ংকর চিন্তিত।

অথচ জামিল এসব কিছুই শুনছিলো না। সে ভাবছিলো, মার্চের প্রথম সপ্তাহেই গ্রামের বাড়ি থেকে বাবা আর মা'কে নিয়ে আসবে। বাবা যদি দেখে এই দোতলা দালান। ইলেকট্রিকের আলো।

শফিকের কণ্ঠস্বর তখন জামিলের স্বপ্নময় চতুর্ভুজটাকে ভেঙে ফেলালো। শফিক চিৎকার দেয়, 'ধুস্ শালা, ওইসব কচকচানি রাখ। আগে মাল বাইর করো। এক সিপ্ মাইরা দেই।'

জয়ন্ত তেতে ওঠে। 'তোমরা খালি ফাইজলামি আর মাতলামি কইরা যাইবা। আইজকা একটা ইমপরটেন্ট দিনেও কি তোমরা সিরিয়াস হইতে পারো না?'

'আহ্হা। সিরিয়াস তো আমরা সবাই। আজকে রাতেই আমাদের ঘোষণা দেয়া হবে, উই আর নো লংগার উইথ দ্য ইমপেরিয়ালিস্ট পার্টি।' বলতে বলতে শফিক বোতল বের করে। বেঁটে সাইজের সোনালী মাথার বোতল দেখেই চুক্ চুক্ করে উঠলো জামিল। আশ্চর্য! শফিক একটা কাজের ছেলে বটে। কোথ্থেকে যে কি জোগাড় করবে ভাবাই যায় না। তো বোতলটার রূপালী বর্ণনা চলে, এই কাড়াআক্রার বাজারে দাম কমসেকম তিন চারশ টাকা। 'তা হোক—শফিকের হার্ট আছে বলতে হয়। তবু সে নিষ্কম্প কণ্ঠ বজায় রেখে বলে 'একুশে ফেব্রুয়ারীর চার্মই অন্যরকম। বিদ্রোহ আর বিপ্লবের দিন।'

ছিন্নবিচ্ছিন্ন কথাবার্তার মধ্যে আবদুল একজগ পানি দিয়ে গেলো। চানাচুর আর পিঁয়াজ। জামিল ভাবলো, কোবাদ আলী মালিতার কথা। মাথাল মাথায় সিড়িঙ্গাপারা লোকটা—মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। লোকটা আজ এখানে থাকলে, বিশ্বাসই করতে চাইতো না যে, তার পুত্র একুশে ফেব্রুয়ারী পালন করবে। একুশে ফেব্রুয়ারী কি বুঝতে পারবে লোকটা! বাবার প্রতি ঘৃণা হলো তার। বুড়ো হামড়া—বাংলাদেশের বিপ্লবকে পিছিয়ে দিচ্ছে হাজার বছর। মনে হয়, শুধু দু কোটি মানুষ খুন হলেই এদেশে বিপ্লব ঘটে যাবে। কোবাদ আলী মালিতার মত ভূমিহীন কৃষকদের বেঁচে থেকে কি লাভ।

শফিক জ্যাকেটের বুকের চেইন নামিয়ে দেয়। তারপর গেলাস হাতে নাচতে থাকে। একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি। জয়ন্ত হো হো হাসে। একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি। শফিকের বুকের লোম দেখা যায়—তার গুণগুণ সুরধ্বনি ঘরের বদ্ধ হাওয়ায় ঝুলতে থাকে। জয়ন্ত বললো, 'সংগ্রামের সময় আপনি গান লিখতেন না। আই মিন গীতিকার?'

'অফকোর্স। কত গান লিখেছি। ফর দ্য সেক অব মাই মাদার-ল্যাণ্ড।' শফিক গ্লাসে একটা তরঙ্গ তুললো।

জামিল ভাবলো তার বাবার কথা। লোকটা কি সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল? গ্রাম থেকে এবার আসার সময় জামিলকে বলেছিলো, বাজান তুই গেরামে থাইক্যা যা। তগো পলিটিকস কি গেরামে হয় না?

'এনিওয়ে। আমার মনে হয়, আমরা মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসতে পারি।' জয়ন্ত দৃঢ়স্বরে বলে। 'শামসু ভাই এলে সবকিছু গুছিয়ে বলতে পারবেন। কথা হচ্ছে আজকের এই শহীদ দিবসটাকে আমরা বেছে নিলাম কেন? তাই না?'

জামিল এক লহমায় বাস্তবে ফিরে আসে, 'একুশে ফেব্রুয়ারী হচ্ছে প্রতিবাদের দিন। জাগরণের দিন। আজকের এই মহতি দিনে আমরা সোজাসুজি জনতাকে জানিয়ে দেব যে, পুরানো পচা পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই। আমরা নতুন পলিটিক্যাল বেইস তৈরী করতে চাই। এ নিউ জেনারেশন।'

কামাল এতোক্ষণ কিছু বলেনি। সে জামিলের বক্তৃতা শুনে মুখ খোলে, 'কিন্তু একটা কথা আপনারা ভাবছেন না কেন? ওরা কি আমাদের ছাড়বে ভেবেছেন? শহীদ মিনার কিংবা যেখানেই আমরা মিটিং করি না কেন ওরা কি প্রবেলম সৃষ্টি করবে না?

'ওরা কারা? আমাদের পুরানো সংগঠনের লোকজন? প্রবেলম সৃষ্টি করলে আমরাও তার যথাযথ উত্তর দিমু।' জয়ন্তর কপালের পাশে দুটো নীল শিরা জেগে ওঠে। সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে লড়াই কি করে করতে হয় আমাদের জানা আছে—এন এস এফের বিরুদ্ধে আমরা কিভাবে লড়েছিলাম, মনে নেই? একাত্তরের বারুদভরা দিনগুলো কি এমনি এসেছিলো? জয়ন্ত চশমা খুলে রুমাল দিয়ে কাঁচ পরিষ্কার

করে, আর ধোঁয়াশার মতো চারভিতে দ্রুত দৃশ্যপট বদলাতে থাকে, তখন যেন একটুক্ষণের জন্য পিন-পতন নিঃস্তব্ধতায় মানুষের মুখশ্রী দেখা যায়—ভয়ানক চিন্তিত এবং ক্রোধময়।

বাইরে রাস্তা দিয়ে তখন ট্রাক মিছিল চলে যাচ্ছে। এ্যামপ্লিফায়ারে বেজে উঠলো সংগীত, আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি? ফেব্রুয়ারীর বসন্তবাতাস এইসব টেনে আনে, নগরীর সকল স্বপ্নকে জাগরিত করে দেয়—আর এই ঘরের মধ্যে কার্ল মার্কসের বই, ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ, আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রসঙ্গে, পুঁজির বিকাশ আর রজনী পাম দত্তের মূল্যবোধ নিরাকার ভাসমান হয়ে যায়। ত্রিমি ত্রিমি ব্রাশ ফায়ারের লক্ষ্যহীন শব্দ তখন রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারীর সঙ্গে তাল মেলালো। জয়ন্ত বোতল রেখে দৌড়ে যায় জানালার দিকে, বাঙ্গালীরা দেখাইতেও পারে, বাঙ্গালীরা দেখাইতেও পারে। ফাস্ ক্লাস। ফাস্ ক্লাস।...

এই সময় বিশ্রী আর্তনাদ করে দরজাটা খুলে যায় এবং শামসু ভাইয়ের দাড়িওয়ালা গম্ভীর মুখ, মাথাভর্তি বাবড়িচুল দুলে ওঠে। লিডার! লিডার! সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে তাকিয়ে দেখে, আরে একি লিডারের সঙ্গে যে নারীমূর্তি! কানিজ ফাতেমা না! উনসত্তরে ছাত্রী হলের ভি, পি ছিলো—এখন বুঝি কোন নারী আন্দোলনের সভানেত্রী। জামিলের ভিতরে ভয়ংকর বিস্ময়, কতদিন পরে দেখা! কানিজ চিন্‌তে পারছো?—এই বিস্ময় তার বুকের কপাট ধরে নাড়া দেয়। কিন্তু কানিজ ফাতেমার অভিব্যক্তিহীন মুখ কোন স্বাচ্ছন্দ্য আনে না।

'তোমাদের সব খবর ভালো তো? সবাই এসে গেছো দেখছি।' শামসু ভাই মৃদু হেসে শুরু করলেন। 'তাহলে সভার কাজ শুরু করা যাক। তার আগে কানিজ ফাতিমার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেই।' এই বলে শামসু ভাই কানিজকে দেখালেন। 'ওর নাম কানিজ ফাতেমা, ও আমাদের সংগঠনকে সাপোর্ট করছে।'

কানিজ গায়ের চাদরটাকে ভালোভাবে জড়িয়ে, সবাইকে হাত তুলে সালাম জানায়। শফিক টেবিলের ওপর থেকে স্টিললাইফ সরাতে গিয়ে হোঁচট খায়। জয়ন্ত তখন একটা সিগারেট ধরিয়েছে। শামসু ভাইয়ের

চোখ দুটো যেন ইস্পাত দিয়ে তৈরী, অনড় অচল হয়ে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছে—'তোমাদের সবকিছু ঠিক আছে তো ?'

ইয়েস। ইয়েস। এভরিথিং ইজ রেডি। এই যে হ্যাণ্ড বিল, পোস্টার, ব্যানার, সংকলন...

'কই ব্যানার দেখি ?'

লাল কাপড়ের ব্যানার খুলে দেখলো সবাই।

'ও কে। সাড়ে চারটার মধ্যেই আমরা শহীদ মিনারে পৌঁছবো। তারপর ওখান থেকে সভামঞ্চ ... সাংবাদিক সম্মেলন ... ঘোষণাটা পড়বে তুমি, জামিল।' —একথা বলে শামসু ভাই জামিলের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

জামিল অনিমিখ তাকিয়ে থাকে। ঘোষণাটা তাহলে তাকেই পড়তে হবে! বুকের মধ্যে ঝংকার উঠলো, বিচ্ছিন্নতা মানে কি তবে নতুন উদ্বোধন ? সেই রহস্যময় স্বর যা তাকে রূপকথা থেকে ফিরিয়ে আনে, এখন এক আশ্চর্য জিজ্ঞাসা হয়ে ঝুলছে।

'কি ব্যাপার জামিল ? এনিথিং রং ? তুমি এতো বিষন্ন হয়ে গেলে ? শামসু ভাইয়ের গম্ভীর মুখ নড়ে উঠলো।

তখন জয়ন্ত মুখ খোলে। 'শামসু ভাই, এখানে মনে হয় একটা কমুনিকেশন গ্যাপ রয়ে গেছে। জামিল মনে হয় ব্যাপারটাকে সহজ-ভাবে নিতে পারছে না ?'

'তোমাকে ফ্রাসট্রেটেড মনে হচ্ছে জামিল। প্রগতিশীল সংগ্রামে তোমার দ্বিধা ...। শামসু ভাইয়ের উদাত্ত আহবান জামিলের স্বপ্নহীন বিষাদের রাজ্যে পালতোলা নৌকার মতো উজানে যায় ঃ এটা কি রকম রাজনীতি আমি বুঝতে পারছি না, এটা একটা বিশ্রী মর্মবেদনা, সে বলতে চাইলো, আমরা ভেঙে যাচ্ছি কেন। কিন্তু তখন জয়ন্ত স্বাভাবিক, কামালের হাত থেকে সিগারেট যায় শফিকের কাছে, কানিজ ফাতেমার নরোম ঠোঁটে রাঙাহাসি এই বিদঘুটে রাত্রিকে ঝাঁকুনি দিয়ে যায়।

'ফ্রাসট্রেশন আসতে পারে। আমি বিশ্বাস করি। মাত্র দুইবছর আগে যুদ্ধ করে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি। কিন্তু এখনো জনগণের মৌলিক মুক্তি অর্জন সম্ভব হয়নি। ...ফ্রাসট্রেশন তো স্বাভাবিক।' শামসু ভাই দৃঢ়স্বরে কথা বলে, অতিমানবের মতো মনে হয় তাকে,

যেন ইতিহাস তার দুই আঙুলে সূতার মতোন জট পাকাচ্ছে। তখন বাইরে ঠা-ঠা বন্দুকের শব্দ, পুনরায় বিস্ফোরণ, তাই শুনে শামসু ভাই ভেঙে ভেঙে বললেন 'দেখ, ছেলে ছোকরারা অস্ত্র নিয়ে ঘুরছে, ওদের ঘরে ফেরাতে হবে না? কি বলো জয়ন্ত?'

জয়ন্ত মাথা নাড়ে। কানিজ ফাতেমা তখন কথা বলে, 'আমার মনে হয় শামসু ভাই, জামিল ভাই এখনো তার রাজনৈতিক বিশ্বাস খুঁজে পাননি?'

জামিলের ঠোঁট কেঁপে উঠলো তখন, 'আমার একটা প্রশ্ন ছিলো শামসু ভাই।' শুকনো গলায় সে বলতে থাকে, 'আমরা নতুন সংগঠন গড়তে চাচ্ছি কেন? পুরানো সংগঠনের আদর্শ থেকে আমাদের পার্থক্য কোথায়?'

কঠিন উদ্ধত চোখ ফের ঘুরে আসে। আসলে গণতান্ত্রিক বিষয়টা বুঝি এখনো খোলাসা করে বলা হয়নি। শামসু ভাই তার দাড়িতে হাত বুলালো, চাদরটাকে শরীরের সঙ্গে আটোসাটো করে বললো 'পার্থক্য অনেক। পুরানো সংগঠনের ভিতরে নেতৃত্বের ব্যারাম হয়েছে, তুমি তো ভালো করেই জানো। ওখানে থাকা আর সম্ভব নয় আমাদের।' আমরা তাই নতুন পথ খুঁজছি।'

'কিন্তু আদর্শবাদ·····'

'আদর্শবাদ টাদর্শবাদ পরে হবে। আগে একটা সেপারেট প্ল্যাটফর্ম গড়ে নিতে দাও তো, ইনফ্যাক্ট আমাদের সামনে এখন বহুপথ খোলা রয়েছে জামিল। এটা উনসত্তর নয়, এটা উনিশ শ' তিয়াত্তর। রিমেম্বার। 'আমাদেরকে একটা পথ বেছে নিতেই হবে।'

শফিক এতোক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে শুনছিলো। সহসা সে বলে, 'কিন্তু নতুন সংগঠন করতে হলে তো প্রচুর টাকা পয়সা দরকার। তারপর পার্টির—একটা কনস্টিটিউশন। মানে একটা সিদ্ধান্ত।...

শামসু ভাই প্রায় হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'আহ্ সব কিছুই হবে।' তার ভুরু কুঁচকে উঠলো, 'টাকা পয়সার জন্য তোমরা চিন্তা করো না। টাকা পয়সা আপনি এসে যাবে। ওটা কি একটা ফ্যাক্টর! ও বিষয়টা আমিই দেখবো—তোমরা সাংগঠনিক ব্যাপারে চিন্তা করো...।

নিঃসহায় মুহূর্তগুলো কেটে যায়, স্বপ্নতাড়িত আর রহস্যময় সেই স্বর, ইস্পাতের তৈরী নিথর চোখ গভীর আবেগে এগিয়ে আসে। 'আমি তোমার প্রশ্নেমগুলো বুঝতে পারছি জামিল। রাজনীতি 'এ বিগ এণ্ড এণ্ডলেস গেম—' তার কাঁধে হাত রাখলো সে, 'ভাঙ্গা গড়ার মাঝখানেই আমাদের এগিয়ে যাওয়া, কার্ল মার্কস তো বলেছেন, পৃথিবীর ব্যাখ্যা নয়, পৃথিবীর পরিবর্তন...। নিঃশ্বাসরুদ্ধ এসব শোনে জামিল, তখন কোবাদ আলী মালিতার ম্লান মুখ উঁকি দেয় না, দূরে অবসন্ন কোকিল ডেকে উঠছে বেলি রোডের গাছের শাখায়, আর সে অনুভব করে ঃ মাথার মধ্যে ভারি কিছু জমে আছে, যা সে কোনদিন সরাতে পারবে না।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললো 'ও একটু সেন্টিমেন্টাল। পুরানো পার্টির মোহ ছাড়তে পারে না। যাই হোক এবার আমরা কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দেবো। সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দাও ...।

শহীদ মিনারের কাছে মিছিল পৌঁছতেই ওরা দেখলো চারদিকে ঝলমল আলোর ঝর্ণাধারা। মিছিলের হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হয়েছে আর মিনারের শরীর বেয়ে উপচে পড়ছে ফুলের সমারোহ। প্ল্যাকার্ড আর স্মৃতিপত্র--মানুষের মহামিলন। 'অমর একুশে' 'মহান ৮ই ফাল্গুন স্মরণে', 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো', তারপর 'জয় আমাদের সুনিশ্চিন্ত'...দেখতে দেখতে জামিলের কানের কাছে শ্লোগান ওঠে ঃ সামনে লড়াই কমরেড, গড়ে তোল বেরিকেড।

জামিলের মনে হলো ঃ এখান থেকে একটা জাতীয়তাবাদ শুরু হচ্ছে নাকি? এতো মানুষ একসঙ্গে জমজমাট মৌচাক হয়ে শুধু স্মৃতির রাজ্য খুঁজে ফেরে। ব্যানারের একদিকে জামিল, অন্যদিকে জয়ন্ত। ওরা হেঁটে যায়। মাঝখানে কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে শামসু ভাই, কানিজ ফাতেমা। শামসু ভাই চাদরটাকে বুকের ওপর দু ভাগ করে রেখেছে। জ্বলজ্বল আলোর তীব্রতায় শামসু ভাইকে অসীম ক্ষমতাবান মনে হলো। লোকটার জুলফির কাছে শাদা চুল, উদ্ধত গোঁফ, আর দাড়িওয়ালা চোয়ালের গর্তে নিষ্ঠুর ভঙ্গিমা। তার পাশে হাত তুলে কানিজ ফাতেমা চিৎকার দিলো ঃ মারকিন সাম্রাজ্যবাদ, নিপাত যাক, নিপাত যাক।

তখন ঠাণ্ডা বাতাসে মাথা রেখে জামিল একটুখানি ভেবে নেয়, কানিজ কি সত্যি সত্যি আমাকে চিনতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলো? পোস্টার আর মিছিল?

ফেস্টুন, ব্যানার, মিনার, সম্মেলন, গণজমায়েত। কি গম্ভীর আয়োজন। মাইকে গান হচ্ছেঃ ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। মিছিল এগিয়ে যায়। মাথায় লালকাপড় বাঁধা যুবকের দল হৈ চৈ করে। জামিল ফিশ্ ফিশ্ করে বললো, 'শফিক, আমাদের পার্টির পুরানো বন্ধুরা কি আমাদের ভুলে যাবে? পলিটিক্স কি এতোই কঠিন?'

'ধ্যাৎ। শ্রেণী-সংগ্রামের ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের স্থান নাই।'—একথা বলেই শফিক স্লোগানের সঙ্গে স্বর মেলায়ঃ নিপাত যাক, নিপাত যাক।

ক্যামেরাম্যানের ফ্লাশগান চমকে ওঠে। পলকে অলোকিত হয় রাত। আলোকিত হয় মানুষের মুখ—শামসু ভাইয়ের মুখ। শহীদ মিনার থেকে অনেকটা দূরে, এক সভামঞ্চের ওপর শামসু ভাই মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। হাজারো মানুষের ভিড়ে তখন একটা উত্তাল স্বর বেজে ওঠে। জামিল ঝাপসাভাবে একটা ছবি দেখলো তখন—মুক্তিযুদ্ধের সময় আগরতলার শরণার্থী শিবিরে শামসু ভাই একদিন বলেছিলো জামিলকে 'জামিল, তুমি আমার লগে লগে থাইকো, পার্টি পলিটিক্স কইলাম নতুন মোড় লইতাছে। আমরা মাস-লাইনের দিকে যামু।' এই তাহলে মাস-লাইন। নতুন মোড় নিচ্ছে বাংলাদেশে? শামসু ভাই মাইকের সামনে হাত তুলে দাঁড়ালো এখন। ভাইসব প্রতিটি একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের জন্য নতুন সংবাদ বয়ে আনে।...আমরা পুরানো রাজনীতিতে আর বিশ্বাস করি না। প্রতিক্রিয়াশীলতার দুর্গ ভেঙে ফেলুন...।'

সহসা আবার গুলীর শব্দ। একটা প্রবল বিস্ফোরণ যেন এই আলোকিত রাতকে ছত্রখান করে দেয়। নীলক্ষেতের ইউক্যালিপটাস, কৃষ্ণচূড়া কেঁপে ওঠে। বসন্ত বাতাসে বারুদের নির্যাস আর জনমানুষের হল্লা। জামিল ভাবলো, প্রতিক্রিয়াশীল কোথায়? কেউ যেন বললো, 'পালাও, ওই আসছে।' ট্রাক মিছিলে দেশাত্মবোধক গান হচ্ছিলো, তবু

রণদামামার হুঙ্কার শুনলো সবাই। তখন বিচ্ছিন্ন প্রতিপক্ষের লালচোখ আর মানুষের স্রোত—সবাই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকে—শহীদ মিনার থেকে মেডিক্যাল কলেজের দিকে, বাঙলা একাডেমীর দিকে। কারো কণ্ঠস্বর শুধু 'পালাও। পালাও। ওই ওরা আসছে।' জামিল শুধু আতশ-বাজি দেখলো, মোমবাতির শিখার মতো দুলে দুলে উঠছে শহীদ মিনারে, তার আলো আর ফুলের সমারোহ। শামসু ভাই কোথায়? শামসু ভাই? কানিজ ফাতেমা! জয়ন্ত? শফিক? হাঁটুতে আর কনুইতে হামাগুড়ি দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কেউ। সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক স্বচ্ছতায় সব কিছু দৃশ্যমান হয়, আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো জামিল; প্রথম ভোরের আলো স্পর্শ করছে পৃথিবীকে, আর ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে ভেসে যাচ্ছে। ব্যানার ফেলে দিয়ে সে প্রাণপণে দৌড়াতে থাকে, গভীর স্বপ্নের মতো এলোমেলো মনে হয় সব কিছু আর মাথার মধ্যে ঘোলাজল, ঘোলাজল, ঘোলাজল শুধু ঘোলাজল।...

চেতনার চোখ

আনিস চৌধুরী

প্রথম প্রথম চিনতাম না। যদিও দেখতাম প্রায়ই। বাইশ চব্বিশ বছরের তরুণ। লম্বা মত। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। চোখে কাল পুরু ফ্রেমের চশমা। স্যাণ্ডেল পায়ে টেনে টেনে চলত। ওর দৃষ্টিতে এমন একটা কিছু ছিল, অবজ্ঞা করা সম্ভব ছিল না। দেখা হলেই সালাম দিত। আমিও সামান্য মাথা দুলিয়ে প্রতিসম্ভাষণ জানাতাম। এর বেশি অন্তরঙ্গ হবার ইচ্ছে ছিল না। খবরের কাগজের অফিসে ভাগ্যান্বেষীদের সমাগম অহরহ। কিছুদিন ঘোরাফেরার পরে কাজের ধারা স্বচক্ষে দেখে অধিকাংশেরই মোহ কেটে যায়। তারা ভুলেও এ পথ মাড়ায় না। ভেবেছিলাম এ ছেলেটিরও তাই হবে। কিন্তু হল না।

একদিন সোজা আমার সামনে এসে হাজির। হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে বলে, আমার নাম শাহেদ। আজ থেকে জয়েন করলাম জুনিয়র সাব-এডিটর হিসেবে।

বললাম আনন্দের কথা। লেগে পড়ুন।

শাহেদ প্রতিবাদ করে। বলে, দেখুন আনওয়ার ভাই আমাকে আপনি আপনি বলবেন না।

তারপর একটু থেমে আবার বলে আপনার হেল্প ছাড়া কিন্তু পারব না। সে জন্যে বেছে বেছে দুপুরের শিফ্‌ট নিলাম। আশা করি নিরাশ করবেন না।

ভাল লাগল। অনেকদিন পর অন্তত কেউ নিজের যোগ্যতা ও সামর্থ্যের স্বীকৃতি দিল। মন থেকে যদি নাও দেয়, মুখে যে বলেছে, এটাই কম কি।

আমি ওকে ভরসা দিয়ে বলি, পরওয়া নেই।

প্রথম দিন থেকেই সে উঠে পড়ে লাগল। নিজে থেকেই উদ্যোগী হয়ে কপি তৈরী করে। এটা ওটা জিজ্ঞেস করে। কোন খবরে কোন সাইজের হেডলাইন যাবে, পরামর্শ চায়। টেলিপ্রিণ্টার থেকে খবর ছিঁড়ে নিয়ে আসে। আশ্চর্য প্রাণচাঞ্চল্য। অফুরন্ত উদ্যম।

দরকার হলে একবারের জায়গায় তিনবার কপি লেখে। ভুল ধরে দিলে বিনয়ের সঙ্গে বলে, প্রথম প্রথম হবে। আপনারা রয়েছেন, আপনাদের কাছ থেকে শিখে নেব।

তখন তার ওপর রাগ করা দূরের কথা উল্টো বলি, কি ব্যাপার, তুমি যে একাই দু'শিফটের কাজ করে ফেললে। এরকম হলে যে আমাদের ভাত মারা যাবে।

এক রকম জোর করেই ওকে বাড়ি পাঠাতে হত। না বললে সকাল থেকে রাত অবধি হাসি মুখে কাজ করে যেতে আপত্তি নেই শাহেদের।

কেউ শিফ্‌টে এল না, সে হাজির।

কোন কোনদিন একই সঙ্গে দু'জনের ছুটির আবেদন। ডিউটি চার্ট করতে আমাদের গলদঘর্ম।

শাহেদ পাশে দাঁড়িয়ে বলে, অত কি ভাবছেন আনওয়ার ভাই। আমাকে লাগিয়ে দিন ডিউটিতে।

আমি বলি, গত উইকেও ত তুমি অফ্‌ ডে নাওনি।

তাতে কি। বাসায় বসে বসে কি করব। এখানে থাকলে তবু আপনাদের কাছ থেকে এটা ওটা শিখতে পারি।

কিছুদিনেই চমৎকার গুছিয়ে নেয় কাজ। মোটামুটি ধারা তার আয়ত্তে। খুব বেশি একটা কলম চালাতে হয় না। তার চেয়েও বড় কথা, বিপদে আপদে শাহেদ সকলের ভরসা।

তাই সেদিন যখন গম্ভীরভাবে একখানা চেয়ার টেনে আমার সামনে এসে বসল, বুঝলাম কিছু একটা ঘটেছে। এমনিতে সে ফুর্তিবাজ। হৈ হট্টগোলে অফিস মাতিয়ে রাখে।

হাতের কপিখানা সরিয়ে রেখে বললাম কি হল। কথা বলছ না কেন।

অবশেষে মুখ খুলল শাহেদ। আর বলবেন না বরকত সাহেব রিপোর্টিং-এ ডিউটি লাগিয়েছেন।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে ওর পিঠে চাপড় দিয়ে বলি কন্‌-গ্র্যাচুলেশনস্‌। এত ভাল কথা। আমরা ডেস্কে কলম ঘষে ঘষে হয়রান। বরাত খুলল না। এ নিয়ে মন খারাপের কি আছে?

শাহেদ মৃদু হাসে। বলে জানি আপনি খুশি হবেন আনওয়ার ভাই। কিন্তু আমার যেন কেমন লাগছে।

আমি ধমক দি, কেমন লাগছে মানে। চা অর্ডার দাও। সিলিব্রেট করি। শাহেদ বলে তা দিন। আমার প্রব্লেমটাত শুনলেন না।

বললাম, কি প্রব্লেম বল।

শাহেদ মুখ নিচু করে ফিস্ ফিস্ গলায় বলে, শুনেছি আজ ট্রাবল হতে পারে। ছাত্ররা সহজে ছাড়বে না। এমনকি ফায়ারিং টায়ারিংও হতে পারে।

প্যাকেটে একখানাই সিগ্রেট ছিল। ওখানায় অগ্নিসংযোগ করে বলি, সেরকম সম্ভাবনা ত সব সময়ই থাকে।

আমার কথার সূত্র ধরে বলে, সে কথাইত ভাবছি। নিজেই যদি ঝামেলায় পড়ে যাই।

কিছুক্ষণ থেমে গিয়ে আবার আমার সমর্থন আদায়ের আশায় জিজ্ঞেস করে, এ রকম ত হয়, হয় না?

আমি শাহেদের উদ্বেগের কারণ বুঝি। তাকে হতাশ করার ইচ্ছে নেই। তবু বিপদের ঝুঁকি যে আছে সেটা খোলাখুলি বলাই ভাল। বলি, হবে না কেন, হরদমই হচ্ছে। লড়াইত দূরের কথা দৈনন্দিন দুর্ঘটনায় কত সাংবাদিক প্রাণ দিচ্ছে না? ঐ ত সেদিন পড়লে না কাগজে, সান্-ফ্রান্সিসকোতে বিধ্বস্ত বিমানের ছবি তুলতে গিয়ে ওয়ার্ল্ড টাইমসের সাংবাদিক ওখানেই শেষ? তাই বলে ত আর সংবাদিকতা শেষ হল না।

শাহেদ মনযোগ দিয়ে শুনছিল। বলল, তার মানে?

তার মানে, বেচারি সাংবাদিক মারা গেল। তার ক্যামেরা পাওয়া গেল অক্ষত। ঐ ছবি পরে ছাপা হল কাগজে।

আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে বলল, আপনিও কি ঐ রকম একটা পরিণতি চান?

আমি হেসে ফেলি। বলি, পাগল। তোমার ওয়েল উইশার হয়ে সেটা আশা কর কি করে।

খুব একটা দ্বিধামুক্ত হল না শাহেদ। বলল, শুরুতেই এ রকম একটা 'এসাইনমেন্টে' না দিলে চলত না?

ততক্ষণে চা এসে যায়। ওর দিকে এক কাপ চা বাড়িয়ে দিয়ে বলি, সাংবাদিকতা কঠিন জিনিস ইয়ং ম্যান। এখনও সময় আছে। জেনে শুনে এ লাইনে এলে কেন। বলছিলে বাপ মায়ের একমাত্র সন্তান।

হ্যাঁ।

একমাত্র সন্তানদের জন্যে ত এ লাইন নয়। দশ এগারজনের একজন হলে অন্য কথা ছিল।

এক চুমুক দিয়েই কাপ সরিয়ে দেয় শাহেদ। বলে, না ব্যাপারটা সিরিয়স্‌লী নিচ্ছেন না আনওয়ার ভাই।

কে বলল নিচ্ছি না। আমার মনে হয় তুমি 'রিগ্রেট' করে দাও।

তাহলে 'চীফ' রাগ করবেন না?

চীফ মানে নিউজ এডিটর বরকত সাহেব।

তা করবেনই।

এরপর শাহেদ প্রসঙ্গটা আর তুলল না। আমিও আলোচনায় ক্ষান্ত দি। শাহেদ বসে বসে কলম নিয়ে কাগজে হিবিজিবি লাইন টানতে থাকে। আমিও এক সময় কাজে ডুবে যাই। শিফটের দু'জন অনুপস্থিত একা সামলাতে হচ্ছে। মুখ তোলার উপায় নেই। ওদিকে কপির জন্যে ক্রমশ তাগাদা প্রেস থেকে। ততক্ষণে ভুলেই গিয়েছিলাম শাহেদের অস্তিত্ব।

অন্য টেবিলে টেলিফোন বাজছিল। উঠে গিয়ে ওটা ধরতে গিয়েই চোখে পড়ল শাহেদ নেই। মনে মনে একটু অনুশোচনা হল। বেশি কিছুত নয়, সামান্য একটু সহানুভূতি ও সান্ত্বনার আশায় সে এসেছিল। তাও নিজের লোক মনে করে। নিজের কিছুটা হৃদয়হীনতার জন্য মনে মনে ক্ষোভ হল।

ততক্ষণে সন্ধ্যের শিফটের লোকজন আসতে শুরু করেছে। তাদেরই একজনকে জিজ্ঞেস করলাম শাহেদের কথা।

জানতে পারলাম সেই দুপুরের দিকেই সে বেরিয়ে যায় মেডিক্যাল কলেজের দিকে। ওখানকার সিচ্যুয়েশন ভাল না। বিকেল তিনটের দিকে ফায়ারিং হল। চারজন মারা গেছে। বহু জখম। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের গায়েও এসে লেগেছে কিছু বুলেট। খুব থমথমে ভাব। কিছু বলা যায় না।

তাহলে শেষ পর্যন্ত রিপোর্টিং করতে গেল শাহেদ। এতক্ষণে ত তার ফিরে আসা উচিৎ। আর কিছু না হোক অন্তত কোন জায়গা থেকে একটা টেলিফোন করতে পারত। ঠিক করি...ওর খবরটা জেনেই

যাব। ঘটনা ওর মুখেই শোনা যাবে। আদতে হলোও তাই। বরকত সাহেব টেলিফোন করে জানাল আসতে পারবে না। রাস্তাঘাটে কিছু চলছে না। না আসা পর্যন্ত যেন 'দুর্গ' সামলাই।

অন্য সময় হলে ওজর আপত্তি তুলতাম। সেদিন এক কথাতেই রাজি হয়ে যাই। শাহেদের জন্য অপেক্ষা ছাড়াও আরেকটা কারণ ছিল। ততক্ষণে রাস্তাঘাট খালি। তাছাড়া তাড়াহুড়ো করে ফেরারই কি আকর্ষণ। ঘরেত বৌ ছেলেমেয়ে নেই।

সন্ধ্যের আগেই ঝড়ো কাকের মত এসে উপস্থিত শাহেদ। চুল উস্কোখুস্কো। শার্টের বুতাম খোলা। আস্তিনের একদিক ছেঁড়া। ভীষণ ঘেমে এসেছে। পাখার নিচে এসে বসল। সবাই চারদিক থেকে ওকে ছেঁকে ধরে।

কে একজন জিজ্ঞেস করল, শুনলাম গুলী চলেছিল।

শাহেদ বলে, আমি নিজেইত দেখে এলাম।

আমি ওর কানের কাছে মুখ এনে বলি, ভয় লাগেনি?

শাহেদ রীতিমত সিরিয়াস। বলে, প্রতি মুহূর্তেই ভাবছিলাম এই বোধহয় গুলী লাগল। কিন্তু আশ্চর্য কথা কি জানেন আনওয়ার ভাই, ভয়টয় ধারে কাছে ছিল না।

আমি বাহবা দি, শুনে খুশি হলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আমার কথার সূত্র ধরে বলল, আপনি যেটা ভাবছেন তা নয়। আসলে আমার মত ভীরু লোকরা বুঝি একবার সাহসী হয়ে উঠলে বেজায় বেপরওয়া হয়ে যায়।

কথা বলতে বলতে এক তন্ময়তার মধ্যে হারিয়ে যায় শাহেদ। বলতে থাকে, আসলে সেই বিশাল জনসমুদ্রে মিশে যাবার পর একবারও আমার মনে হয়নি আমি শোভাযাত্রা করতে আসিনি, শ্লোগান দিতে আসিনি, বক্তৃতা শুনতে আসিনি। আমি এসেছি রিপোর্ট লিখতে। ঘটনা যেমন যেমন ঘটে তেমন তেমন সাজিয়ে খবর তৈরি করতে।

কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলি, তোমাকেও পাঠান হয়েছিল সে কাজেই।

জানি সে কথা। প্রথম প্রথম একটা অদৃশ্য সীমারেখাও তৈরী করে নিয়েছিলাম আমার আর ওদের মধ্যে। কিন্তু কখন আমি নিজেই যে

সীমা লঙ্ঘন করে জনতার দলে মিশে গেলাম।

তার যুক্তির এমন একটা জোর ছিল, খণ্ডন করা সম্ভব ছিল না। তাই মাথা নেড়ে বলি, তোমার সেন্টিমেন্ট শ্রদ্ধা করি শাহেদ। তুমি ওদের একজন হয়ে জনসমুদ্রে মিশে গেলে ভাল কথা। কিন্তু ওদের কথা বলার, লেখারও যে দরকার আছে, আশা করি সেটা অস্বীকার কর না।

শাহেদ জানাল, সে চেষ্টাও সে করেছে। মিছিলকারীদের দু'চার-জনকে জিজ্ঞেস করেছে, তারা কি চায়। কি তাদের লক্ষ্য।

তারা কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে জানতে চেয়েছে কাগজের নাম। শহীদ নাম বলেছে। নাম শুনেই একজন বলেছে, মিছি মিছি কেন জিজ্ঞেস করছেন। ছাপাতে পারবেন না। আমি চলে এলাম আনওয়ার ভাই।

আমি বলি, একজন কি বলল অমনি হাল ছেড়ে দিলে। অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করলে পারতে।

শাহেদ বলল, এরপর আমার জিজ্ঞেস করার কিছু ছিল না। আমি হাজারো মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে একই প্রশ্ন করেছি। আর তাদের দৃশ্য চোখের দৃষ্টিতে একই জবাব পেয়েছি বার বার।

শাহেদকে জিজ্ঞেস করার দরকার ছিল না। আমি যেন নিজেই দেখছি সেই অপ্রতিরোধ্য জীবন জোয়ার, শুনছি তার তুমুল গর্জন, ভেসে যাচ্ছি খড়কুটোর মত। তবু নিজের কল্পিত দৃশ্যটিকে যেন ওর সদ্য অভিজ্ঞতার ছাঁচে ঢেলে যাচাই করতে ইচ্ছে হয়। তাই জিজ্ঞেস করি, কি দেখলে ঐসব চোখে?

খানিকক্ষণ ওর মুখে কথা সরে না। এক সময় ধীরে ধীরে সে মুখ তোলে। নিতান্ত অসহায়ের মত বলে, সেটাইত জানি না আনওয়ার ভাই। সেটাই জানি না। লেখার ভাষা নেই। যদি বলি আগুন দেখেছি, সেটাত হয় না। চোখে ত আগুন থাকে না। যদি বলি বিস্ময়। সেটাই কেমন করে হয়। তাদের চোখ ত নিষ্ঠুর আচরণ প্রথম দেখছে না। যদি বলি ক্ষোভ দেখেছি, তাহলেও প্রশ্ন থাকে কিসের ক্ষোভ, কার প্রতি ক্ষোভ। আসলে এসবের কোন প্রশ্নেরই জবাব আমার জানা নেই। আমি শুধু জানি ঐ সব চোখের দিকে তাকানোর সাহস আমার নেই। ওদের ক্ষুরধার দৃষ্টি আমার অন্তরাত্মায় ভয় ধরিয়ে দেয়।

আর কি দেখলে?

পেছন থেকে কার গলা শুনে তাকিয়ে দেখি বরকত সাহেব নিবিষ্ট চিত্তে দাঁড়িয়ে।

সচকিত হয়ে বললাম, কখন এলেন সার?

খানিকক্ষণ হল। না এসে কি করি। এসব অক্যাশনে কি ঘরে বসে থাকা যায়। তারপর শাহেদকে লক্ষ্য করে বলল, ভালই হল আপনি গিয়েছিলেন। দেখুন দিস ইজ এ্যান এক্সপেরিয়েন্স অব লাইফ। এ সুযোগ জীবনে বার বার আসে না। কি দেখলেন বলুন।

শাহেদ বলল, হ্যাঁ সার একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। মেডিক্যাল কলেজের ব্যারাকের যেখানটায় গুলী পড়েছিল খানিকক্ষণের মধ্যেই কাদামাটি দিয়ে ডেলার মত কি একটা দাঁড় করানো হল। ক্ষুদে স্মৃতিস্তম্ভের মত। কোন স্থপতি ছিল না, কোন ইঞ্জিনিয়ার ছিল না। আপনা থেকেই উঠল। সামনে লাল চাদর বিছানো। সেখানে অকাতরে চাঁদা পড়ছে। টাকা পয়সা, নোট, মেয়েদের হাতের চুড়ি, গয়না। যে যা পারছে। কেউ চাঁদা চায়নি। দিতেও বলেনি। চাঁদা সম্ভবত ছিল নিহতদের পরিবারের ভরণ পোষণের জন্যে। অথবা, শহীদদের স্মৃতি-স্তম্ভ তৈরির কারণে। কোনটা জানি না।

জিজ্ঞেস করি, তুমি কিছু দিলে?

ও বাঁ হাত মেলে ধরল। অনামিকায় ওর একটা আংটি ছিল। চোদ্দ ক্যারাটের সোনার ওপর রুবি পাথর বসানো। মনে আছে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম সব থাকতে রুবি কেন। ও হেসে বলেছিল কারণ ঐ নামেরই একটি মেয়ের কাছ থেকে পাওয়া। ভালবাসার নিদর্শন কিনা জানতে চাইনি। ওটা সেদিন তার হাতে দেখলাম না।

শাহেদ বোধহয় আমার পরবর্তী প্রশ্ন আঁচ করতে পেরেছিল। তাই বলল, এটা কিছু নয় আনওয়ার ভাই। বাংলাভাষাকে ভালবাসি জানতাম। কিন্তু সেটা যে হৃদয়ের কত গভীর থেকে, আজ রিপোর্টিং-এ না গেলে অজানা থেকে যেত।

শাহেদকে বাধা দেবার কোন ইচ্ছে ছিল না। তার উপলব্ধির জগতে আজ চেতনার নতুন জোয়ার। সে অনর্গল বলে যাচ্ছে। সে জাতির জীবনের এক মহা সন্ধিক্ষণ দেখে এসেছে। আমরা পারিনি। তাই তার

মুখ থেকে শুনেই সান্ত্বনা। তবু কপি দিতে হবে প্রেসে। খবর লিখতে হবে। নিউজ এজেন্সির মেসেজ আসতে শুরু হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন বেতারকেন্দ্রে বিবৃত হচ্ছে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সর্বশেষ পরিস্থিতি সবিস্তারে। সুতরাং এখন থেকেই কপি লেখা শুরু করতে হবে।

শাহেদকে মনে করিয়ে দি, তার কপির কথা। বলি কিছু একটা দাঁড় করাও, তারপর দেখা যাবে। শাহেদ রিপোর্ট নিয়ে বসে যায়। কাজের সুবিধের জন্য যাবতীয় সংবাদ প্রতিষ্ঠানের খবরাখবর তার হাতে তুলে দি।

এই ফাঁকে অন্যান্য কাজ গুছিয়ে নি। ভেতরের পেজের মেক আপ, প্রিন্ট অর্ডার ইত্যাদি শেষ করতে হয়।

শাহেদ ওর রিপোর্টখানা আমার হাতে দিল। দেখলাম সবিস্তারেই লিখেছে। স্বয়ং নিউজ এডিটর উপস্থিত। সুতরাং আমার নাক গলানোর প্রশ্নই আসে না। আমি ওখানা বরকত সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলি, সার শাহেদের রিপোর্ট।

বরকত সাহেব আদ্যোপান্ত রিপোর্ট দেখল। মাঝে মাঝে ঠোঁট জোড়া করে একটু মাথা হেলায়। আবার কখনও সামান্য ভ্রূ কুঞ্চন। শাহেদ উদ্‌গ্রীব হয়ে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে। বোঝা গেল না এগুলো তার রিপোর্টের উল্লেখিত ঘটনা ও বর্ণনার সমর্থনে, না সমালোচনায়।

বরকত সাহেব তার ক্ষুরধার কলমে কখনো তেরচা করে কেটে দিল আগাগোড়া তিন পৃষ্ঠা। কাগজের বুক চিরে গেল। গোটা রিপোর্টে ওর লেখা দু' চারটে লাইনই থেকে গেল।

কেমন মনমরা হয়ে যায় শাহেদ। কাতরভাবে বলে, বাস ওটুকুই থাকবে?

নিউজ এডিটর সম্ভবত সরাসরি এ ধরনের বক্তব্যে অভ্যস্থ নয়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছুঁড়ে দেখে নেয় তাকে এক নজর। তারপর মুখের পোড়া সিগ্রেট-খানা মাটিতে ফেলে জুতোর তলায় পিষে ফেলে। বলে কতটা গেল তার পরিমাপ নিষ্প্রয়োজন। আপনি ফ্যাক্টস দিয়েছেন, মোটামুটি একটা কাঠামো দিয়েছেন। আমি সেটুকু রেখে বাকিটুকু কেটে দিলাম। আপনার কাজ এক রকম। আমার অন্য রকম। দুটো মিলেই রিপোর্ট। এতে মন খারাপ করার কিছু নেই।

তবু সে আমতা আমতা করে বলে, অন্তত মূল প্রসেশনের যে ডেসক্রিপশনটা ছিল সেটা বোধহয় যেতে পারত?

বরকত গম্ভীর ভাবে বলে. ওটা আপনার নিজস্ব অনুভূতি। ওটার সঙ্গে খবরের কোন সমস্পর্ক নেই। নিউজ এবং লিটারেচার দুটো আলাদা জিনিস। আর তা ছাড়া——

তাছাড়া কি সার?

এবার বরকত সাহেব আর চোখে চোখ রাখতে পারল না। দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে বলল. ডোন্ট মিস্ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড মি। আমাদের কিছু লিমিটেশন আছে। সত্যি হলেও সব কিছু ছাপতে পারি না। আমারও সেন্টিমেন্ট আছে।

বলেই বরকত উঠে যায়।

তবু আমি তাকে অন্য ঘরে নিয়ে বসি। বরকত সাহেবের পুনরাবৃত্তি করে বললাম আমাদের রিপোর্ট লেখার আমরা রিপোর্ট লিখি। যার কাটার সে কাটবে। মন খারাপ করার কি আছে।

জানি না আমার কথা তার মনে ধরেছিল কিনা। তবে সে কোন প্রতিবাদ করে নি। এক সময় দাঁড়িয়ে গিয়ে বিদেয় নিয়ে বলল এখন যাই। মাথাটা ধরেছে ভীষণ।

ঐ ঘটনার পর আরও বহু সভাসমিতি আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে মেলা খবর তৈরি করেছে সে। বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছে সেগুলো। ততদিনে শাহেদ আমাদের পত্রিকার বিশেষ রাজনৈতিক সংবাদদাতা। বিশিষ্ট ভাষ্যকার। প্রচুর নাম ডাক। কিন্তু লক্ষ্য করি যতই দিন যায়, তার ভেতর এক গভীর নৈরাশ্য এসে বাসা বাঁধে।

আগের মতই সে কপি লেখে। আজকাল সেও বোঝে। কি যাবে, কি যাবে না। সেরকম করেই লেখে। খুব একটা কাটাকুটির কিছু থাকে না। আমি নিজেও ওর কপিতে তেমন হাত দিই না।

বরাবরের মত কপি লিখে সেদিনও আমার টেবিলে ছেড়ে যায়।

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বলি, চলে যাচ্ছ, কপি দেখবে না?

সেই একই জবাব শাহেদের, কি আর দেখব আনওয়ার ভাই। আমি যা লিখতে চাই তা লিখতে পারি না। সাহসে কুলোয় না। মুরোদ নেই। দেখে আর কি হবে।

আমি ওকে বসতে বলে চা আনাই।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলে শাহেদ তবে একটা কথা কি জানেন। আমার ক্রমশই মনে হচ্ছে আমি আর সবার মত যা লিখছি সেটা আসল ঘটনার ওপর একটা হাল্কা রঙীন মোড়ক লাগানোর মত। আমাদের কাজ যেন আসল ঘটনার শেকড় তুলে তাকে নির্জীব, নিষ্প্রাণ করে তোলা।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলি, তোমার আক্ষেপের কিছু নেই। তুমি নতুন কিছু করছনা যা অন্যরা করে না।

অন্যরা করুক। আমার বিবেচনায় আমি হেরে যাচ্ছি। আমি ত এজন্যে সংবাদিকতায় আসিনি।

তবে কি জন্যে এসেছিলে?

আমি ভেবেছিলাম আমি মানুষের আসল চিন্তাধারা, তার সুখ দুঃখ, তার সব অভিলাষ তুলে ধরতে পারব। এখন মনে হয় সেসব কিছুই হবে না। খবরের কাগজের ঐ বড় বড় হেড লাইনের পেছনে জীবনের কোন স্পন্দন নেই। কোন হাসিকান্না নেই। কোন ভারি নিঃশ্বাস নেই।

প্রশ্ন করি, তুমি কি চাও।

কি চাই জানি না। শুধু জানি আমি অবজেক্টিভ হতে পারিনি। আমি সাংবাদিকতা ছেড়ে দিতে চাই।

বলি, এতদূর এসেও?

হ্যাঁ? আসলে, একুশে ফেব্রুয়ারি আমি খাতা পেন্সিল নিয়ে দাঁড়িয়ে সবার চোখে দেখেছিলাম এক জ্বলন্ত দৃষ্টি। সে দৃষ্টির ভাষা আমি বুঝতে পারিনি। আজও মাঠে ময়দানে ঐ একই দৃষ্টি আমাকে কষাঘাত করে। মনে করিয়ে দেয় আমি এক অর্থহীন মরীচিকার পেছনে ছুটছি। ঐ দৃষ্টির অন্তর্নিহিত মর্মজ্বালা ভাষায় প্রকাশের সাহস আমার নেই। এই ব্যর্থতার বোঝা বয়ে বেড়ানোর মানে হয়না। আমি এজন্যে সংবাদিকতায় আসিনি।

জিজ্ঞেস করি, কি জন্যে এসেছিলে?

শাহেদ খানিকক্ষণ বিমূঢ়ের মত আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, ভেবেছিলাম আমি ওদের কথা বলতে পারব। তুলে ধরতে পারব ওদের সুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা। এখন মনে হয় ওসব কিছুই হবে না।

ওকে বোঝাবার চেষ্টা করি। দেখ শাহেদ তুমি চলে গেলে কি ওদের সমস্যার সুরাহা হবে?

তা না হোক। আমাকে দিয়ে হবে না আনওয়ার ভাই। আমি অন্যদের বরং ঠকাতে পারি। নিজেকে আর ঠকানো সম্ভব নয়। আর কিছুদিন থাকলে আমি আমার সত্তা হারিয়ে ফেলব। আমি একটা হ্যাণ্ডআউট, একটা প্রেস রিলিজে পরিণত হব। আমি নির্ভর-যোগ্য সূত্র ওয়াকিবহাল মহল হয়ে থাকব। আমার অস্তিত্বে সন্দিহান হয়ে পড়ব। তার আগেই বিদেয় নিতে চাই।

একবার যখন সে মনস্থির করে ফেলেছে, জানি তাকে ফেরাতে পারব না। চাকরি ছেড়ে কি করবে শাহেদ বলতে পারল না। বলল, কিছু ত একটা করতে হবেই বাঁচার তাকিদে। কিছু না হলে ফিরে যাব সেই পুরনো গোয়ালে। পুরনো গোয়াল মানে স্কুলের মাস্টারি যেটা সে করেছে খবরের কাগজে আসার আগে।

হেসে বললাম, আবার ঐ খাতা পেন্সিল। একই কথা।

শাহেদ প্রতিবাদ করে। বলে, খাতা পেন্সিল ঠিক। তবে এক কথা নয়। এবার খাতা পেন্সিল হাতে নেব ছেলেমেয়েদের একুশের আদর্শেই উদ্বুদ্ধ করতে। যে খবর আমি লিখতে পারিনি, যে খবর আপনারা ছাপেননি সে খবর তাদের শোনাতে।

যেদিন চাকরিতে এল, আমার সঙ্গেই ওর প্রথম দেখা। যেদিন ছেড়ে গেল সেদিনও শেষ দেখা আমার সঙ্গেই। সে পদত্যাগপত্র রেখেই চলে গিয়েছিল।

এরপর শাহেদের সঙ্গে দেখা হয়নি। জানি না সে তার মনোবাঞ্ছনা পূরণ করতে পেরেছিল কিনা। জানতেও পারব না কোনদিন। কেননা, একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামে শাহেদ প্রাণ হারায় বরিশালের চরফ্যাশনে।